# দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে

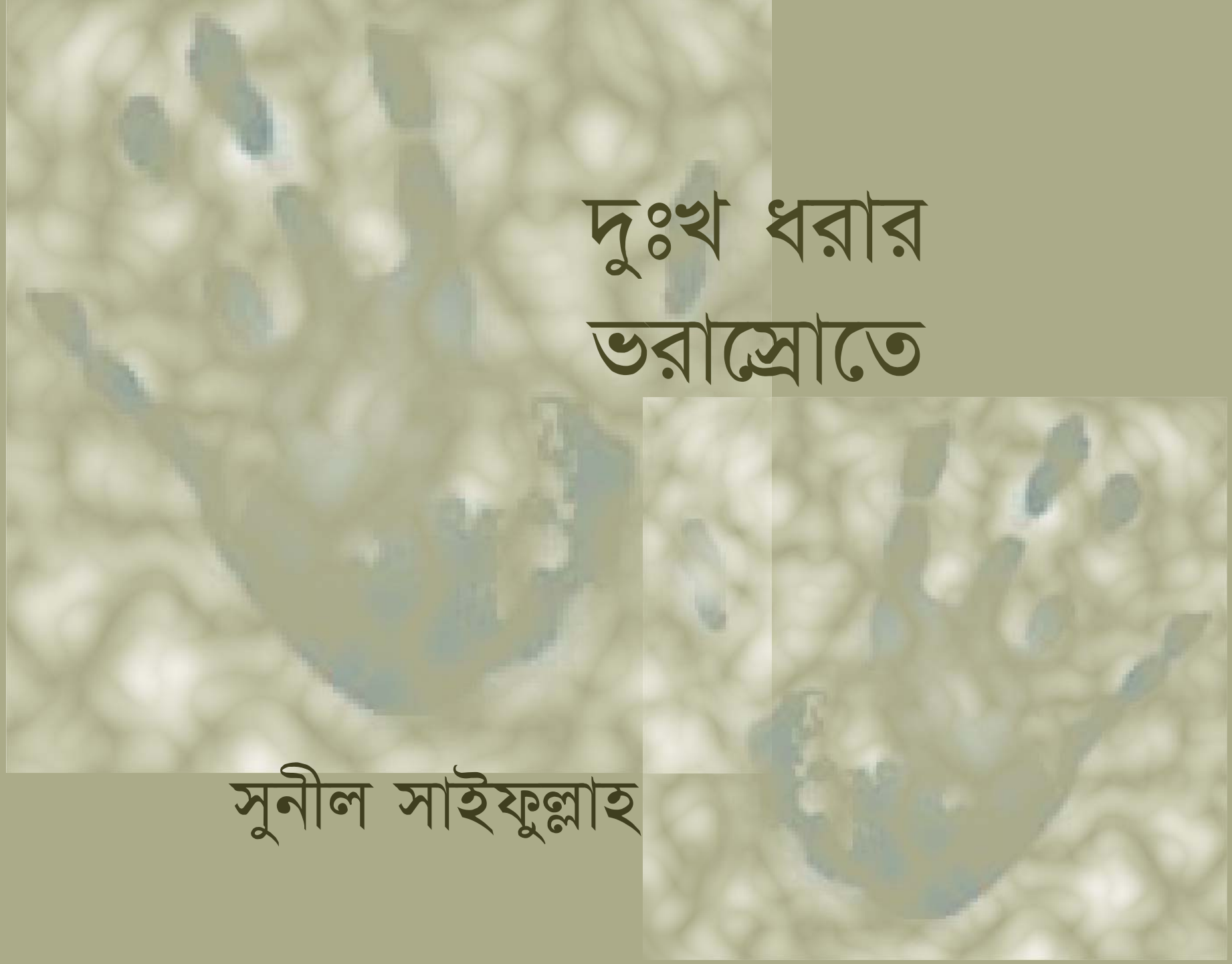

সুনীল সাইফুল্লাহ

# দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে

সুনীল সাইফুল্লাহ

একটি
সচলায়তন
প্রকাশনা

২০০৭

www.sachalayatan.com

# দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে

## সুনীল সাইফুল্লাহ

**জাকসু'র** উদ্যোগে
প্রথম প্রকাশকালঃ
জুন ১৯৮২

**সচলায়তন** কর্তৃক
প্রথম অনলাইন প্রকাশঃ
অক্টোবর ২০০৭

বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ
সুমন রহমান
আছহাবুল ইয়ামিন

প্রচ্ছদ ও অলংকরনঃ
জিয়াউল পলাশ

সম্পাদনা সমন্বয়ঃ
হাসান মোরশেদ

# আমাদের মায়াবী পায়রা ও তার পালকসমূহ

*অথচ নির্দিষ্ট কোন দুঃখ নেই*
*উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতি নেই*
*শুধু মনে পড়ে*
*চিলেকোঠায় একটা পায়রা রোজ দুপুরে*
*উড়ে এসে বসতো হাতে মাথায়*
*চুলে গুজে দিতো ঠোঁট*
*বুক- পকেটে আমার তার একটি পালক*

পালিয়ে যাওয়া পায়রার পালক বুক পকেটে গুঁজে,উল্লেখ্যযোগ্য কোন দুঃখ ও স্মৃতি ছাড়াই যে কবি লিখতো কবিতা- কবিতাতেই নিজের মৃত্যু ঘোষনার দুর্দান্ত স্পর্ধা ছিলো যার- তাকে মনে রাখার কিংবা মনে করার কোন দায় ছিলোনা আমাদের ।

*'সবুজ পায়রার হৃদপিন্ড চিবিয়ে খেয়ে*
*ঠিক বছর পর আমি আত্মহত্যা করে যাবো '-*

ঠিক এরকমই লিখে তার নিজের কবিতায়,তারপর বই প্রকাশের জন্য পান্ডুলিপি তৈরী করে ,সবকিছু গুছিয়ে চলে যান কবি সুনীল সাইফুল্লাহ! যেনো নিজেই এক অনির্দিষ্ট দুঃখ,গুরুত্বহীন স্মৃতি, চিলেকোঠা থেকে উড়ে যাওয়া সেই মায়াবী পায়রা।

আমরা যারা বাংলা কবিতার পাঠক তারা বেশ আধুনিক ও আন্তর্জাতিক হয়েছি- সে বেশ পুরনো খবর । মায়াকোভস্কির আত্মহণনের বেদনায় নীল হয়েছি বহু আগেই, রিলকের গোলাপের কাঁটায় রক্তাক্ত ও হয়েছি। এইসব নিয়ে আমাদের নামী সম্পাদকরা রচনা করেছেন দামী সব সাহিত্যপত্র। ঋদ্ধতার ঢেঁকুর ও উঠেছে প্রচুর। তবু হায় কেনো, কোন প্রণালী ও প্রক্রিয়ায় অনুচচারিত, অনাদৃত রয়ে যায় আমাদের নিজস্ব চাষবাস, মায়াবী পায়রা সকল ?

আর এই আমরা,আমরা ক'জন- আমরাও গতানুগতিক । ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পৃথিবীর নানাপ্রান্তে, যুথবদ্ধ হয়েছি শেষে নিজেদের তৈরী করা এক আংগিনা- **'সচলায়তন'**এ। অনলাইন রাইটার্স ব্লগ 'সচলায়তন' এ প্রয়াত কবি সুনীল সাইফুল্লাহকে নিয়ে প্রথম লিখেন সুলেখক **সুমন রহমান।** সেই আমাদের প্রথম চেনা। সুমন রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নিজের এবং সচলায়তনের পক্ষ থেকে ।

সুমন রহমানের ঐ লেখার সুত্র ধরেই,অন্য সকলের আগ্রহে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সুনীল সাইফুল্লাহ'র একমাত্র কবিতার বইয়ের অনলাইন সংস্করন প্রকাশের । সুমন রহমান নিজে দেশের বাইরে,আমরা যারা বাকী কাজটুকু করবো তারাও দেশের বাইরে । তার চেয়ে বড়ো কথা সেই বই সহজলভ্য নয় ।

আমাদের সাহিত্যপাড়ায় অনেক ব্যস্ততা,অনেক নামী দামী লেখকের বইপত্তরের পাহাড়- কিন্তু আমাদের সুনীল নেই,আমাদের সুনীল সাইফুল্লাহ নেই ওখানে । জানা যায়, সুনীল সাইফুল্লাহর আত্মহত্যার পর জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ কর্তৃক প্রকাশিত সে বইয়ের কপিগুলো খুব সযতনে সংরক্ষন করছেন- বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন কর্মচারী,যিনি সুনীলের কবিতার মুগ্ধ পাঠক ।

এ পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন দায়িত্বপালনে এগিয়ে আসেন **আছহাবুল ইয়ামিন** । ইয়ামিন জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যান,মুল বইয়ের কপি সংগ্রহ করেন,স্ক্যান করে আমাদের পাঠান । আছহাবুল ইয়ামিনের কাছে কৃতজ্ঞ সচলায়তন এবং সুনীল সাইফুল্লাহর কবিতার সকল অনলাইন পাঠক । কেনোনা,ইয়ামিন দায়িত্ব না নিলে আজকের এই প্রকাশনা সম্ভব হয়ে উঠতোনা ।

তারপরের সবটুকু কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছেন শিল্পী বন্ধু **জিয়াউল পলাশ** । প্রচ্ছদ ও অলংকরন,এবং ই- বুক তৈরীর যাবতীয় টেকনিক্যাল কাজের একক কৃতিত্ব তারই । সচলায়তনের সবিনয় কৃতজ্ঞতা তার প্রতি ।

*জেগে আছি শ্রবণে ক্রন্দনে স্বনির্মিত মাটির সংগীতে*
*রাত্রিদিন সাজাই ধূপবাতি মঙ্গলঘট-*
*জন্ম বসবাস পার্থিব সমস্ত কিছুতে হাহাকার করে ওঠে*
*ব্যর্থ অভিমান।*

অভিমানী পায়রা উড়ে গেছে তার নিজস্ব আকাশে। আমরা কেবল কুড়িয়েছি তার ফেলে যাওয়া কবিতা- পালক, বাংলা কবিতার পাঠকের জন্য ।
সম্মানিত পাঠক,আমাদের অভিনন্দন গ্রহন করুন ।।

অনলাইন রাইটার্স কমিউনিটি **'সচলায়তন'** এর পক্ষ থেকে

হাসান মোরশেদ
০১/১০/২০০৭

# সম্পাদকের কথা

আত্মহত্যার  আগে প্রায় দুই মাস ধরে দিনরাত পরিশ্রম করে সুনীল সাইফুল্লাহ তাঁর কবিতার সংশোধন করছিলেন; এটা তাঁর মৃত্যুর প্রস্তুতি - তখন আমরা বুঝতে পারিনি। মৃত্যুর পর তাঁর বালিশের নীচে একটি পান্ডুলিপি পাওয়া গেল। তা দেখেই বোঝা  যায় তাঁর অন্তিম ইচ্ছা ছিল তাঁর বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীগন হয়তো তার কবিতাগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করার জন্যই জাকসুর উদ্যোগে ''দুঃখ ধরার ভরা- স্রোতে'' বের হলো।

সম্পাদক হিসেবে লেখা নির্বাচনের ব্যাপারে আমাকে কিছুই করতে হয়নি- এ সংকলন কবি সুনীল সাইফুল্লাহরই স্বনির্বাচিত কবিতা সংকলন; আমি শুধু বই এর নির্দিষ্ট আকার রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর চূড়ান্ত নির্বাচন থেকে চারটি কবিতা বাদ দিয়েছি। জাকসুর সাহিত্য সম্পাদক হয়েও যদি তাঁর কবিতা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে না পারতাম তাহলে সারাজীবন স্বস্তি পেতাম না- তাই কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই কাজে হাত দিয়েছিলাম। জাকসুর সভাপতি অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সহ সভাপতি মোঃ মোতাহার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক এ. এফ এ. সামসুদ্দীন আমার কাজে যেভাবে সাহায্য করেছেন সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কবি মোহাম্মদ রফিক এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। সুনীল সাইফুল্লাহর প্রতি তাঁর অনুভূতির সাথে আমি পরিচিত; তাই তাঁকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানো থেকে বিরত রইলাম।

'দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে' মূলতঃ সুনীল সাইফুল্লাহর মৃত্যুর দুবছর আগ পর্যন্ত রচিত কবিতার স্বনির্বাচন- শেষের দিকে কয়েকটি পুরনো কবিতা তাঁর নিজেরই জুড়ে দেয়া। তাঁর আরো যে সব কবিতা আমাদের সংগ্রহে আছে তা দিয়ে আরো দু'টি বই বের করা যায়;- ভবিষ্যতের আগ্রহী প্রকাশকের জন্য জানিয়ে রাখলাম; জানিনা সেগুলো কোনদিন আলোর মুখ দেখবে কিনা।

সুনীল সাইফুল্লাহর ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মে মাসে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রচুর কবিতা রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর কবিতার মান এবং সংখ্যা  বিচার করে তাঁকে আশির দশকের অন্যতম প্রধান কবি বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই। এই অল্প বয়সেই তিনি স্বতন্ত্র ও মৌলিক কন্ঠস্বর অর্জন করেছিলেন। তাঁর জীবন ও কবিতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল। কবিতায় এত ঋদ্ধ ও সত্য উচ্চারণ সত্যি বিরল ঘটনা। তাঁর কবিতা কোন নির্দিষ্ট ছন্দে লেখা নয়- অথচ শব্দ চয়ন, শব্দের গাঁথুনি ও গদ্যভঙ্গীর চলমানতা কোথাও ছন্দপতন ঘটতে দেয়নি। বাংলা কবিতায় এ তাঁর এক নতুন অবদান । কীটস, রেঁবোর মতো অমরতা হয়তো তাঁর ভাগ্যে নেই- অন্তত বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা থাকবে এ আমার বিশ্বাস। আপাততঃ বাংলা সাহিত্যের অকাল প্রয়াত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, আবুল হাসান, হুমায়ুন কবির, খান মোহাম্মদ ফারাবীর নাম উচ্চারণ করতে সুনীল সাইফুল্লাহর নামও উচ্চারিত হোক- 'দুঃখ ধরার ভরাস্রোতে' প্রকাশ করার প্রধান উদ্দেশ্য তাই। ব্যর্থতা আর সার্থকতা নির্ণয়ের ভার ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিলাম।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
২৪.৬.৮২

শামসুল আলম
সাহিত্য সম্পাদক, জাকসু ১৯৮২
সাভার, ঢাকা।

*‘পিতৃপরিচয় মুছবো বলে শেষাবধি মুছি নিজেকে।’*

সমস্ত মৃত্যুই স্বাভাবিক। বিশেষত আমাদের এই পোড়া দেশে, এমন অকল্পনীয় বিতিকিচ্ছিরি আর্থ সামাজিক পরিবেশে, যেখানে বেঁচে থাকাই অস্বাভাবিক, বলা যায় প্রায় অসম্ভব, সেখানে মৃত্যুই একমাত্র নিদারুণ নিয়তি। মৃত্যু দ্রুত এসে পড়ে; কিন্তু বেচেঁ থাকার জন্য প্রয়োজন প্রায় অসাধ্য সাধনের মত, বিদ্রোহের অন্তঃশীল আবেগ। তাই মৃত্যুইচ্ছা যেমন অপ্রয়োজনীয় বিলাস-বাহুল্য, ঠিক তেমনি বাঁচার ইচ্ছা সৃষ্টির অদম্য অনুপ্রেরণা যা অবশেষে কুরে খায় সৃষ্টিকর্তাকে।

আর সৃষ্টির জন্যে এমনি অদম্য অনুপ্রেরণা ছিল সুনীল সাইফুল্লাহর অন্তর্গত রক্তধারায় নিরন্তর সক্রিয়। তার এই জেগে ওঠার প্রক্রিয়া, জীবন, জগৎ ও কর্মের সঙ্গে সংযোগ সেতু ছিল তার কবিতা। যে বয়সে সে মৃত্যুকে বেছে নিল, বলা যায় মৃত্যু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, সে বয়সের তুলনায় তার কবিতার সংখ্যা খুব বেশী নয়, তবে একদম কমও নয়; নয় এড়িয়ে যাবার মতো সাধারণ, সাদামাটা শুকনো ঘাসের স্তূপ। তার কবিতা সম্পর্কে যে গুণবাচক শব্দটি অবশ্যই অনিবার্যভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা হলো, তার কবিতা একান্ত তার নিজস্ব, তার আপন রক্তগন্ধমাখা। কবিতা, তার সংগ্রামের অঙ্গীকার, বল্লমের ফলা যা তার নিজের দিকেই তাক করা।

তার কবিতা ছিল তার নিজস্ব একদম নিজস্ব, তার একান্ত নিজের বৃত্তে বেঁচে থাকা। এইসব কবিতা কর্মের মধ্যে অন্য কারো, অন্য অগ্রজ কোনো কবির বা কোনো সতীর্থের প্রভাব খুঁজে পাওয়া অসম্ভব যেমন অন্য কোন ব্যক্তিত্বের প্রভাব

তার জীবন রচনায় ছিল অকল্পনীয়। এর একটি জঠিল কিন্তু সাধারণ কারণ হয়তো এই যে সে কোন আশ্রয় খুঁজে পায় নি, না কাব্যে না জীবনে। এবং এই কারণেই তার দূর যাত্রা হয়ে পড়েছিল এতো বন্ধুর, বিপদ সংকুল।

পাহাড়ের সরু ধার বেয়ে চলতে গিয়ে, খাদে গড়িয়ে পড়ার ঘটনা, প্রায় অবধারিত। আলো-হাওয়া, আকাশ সুর্যস্তি রক্তে মাংস-মস্তিষ্কে ভাঙনের টানে তোলপাড় ঘটাবেই। তারপরও রয়েছে কতো কানাগলি, রূপকথা, রাজারপুর, হারিয়ে যাওয়া সকাল, অন্তহীন দুপুর-রাত্রি; এমনি মায়াবী ধ্বংসের গহ্বর খুঁড়ে যাত্রাপথ তৈরী এতোই কী সহজ? সে জীবনেই হোক আর কাব্যেই হোক। সাইফুল্লাহ সেই যাত্রার খাদ কেটেছে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বুনোট গদ্যধর্মী কাব্যরচনায় যা তার নিজের চলার ও চলার সংগ্রামের মতো নিজস্ব।

*‘চুমু নাও ক্ষমাশীল মৃত্তিকা মহাদেশ/ সামনে ক্রন্দনশীলা পথ।’*

ভালবাসায় যেমন সামান্যতম ফাঁকির আশ্রয় নিয়ে পার পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনি ঘটে সৃষ্টি কর্মের ক্ষেত্রে। সাইফুল্লাহ কখনো ফাঁকির

দ্বারস্থ হয় নি যেমন কাব্যের, তেমনি জীবনে। আর কে না জানে, এই ধরনের সততা কতোটা হননকারী। আর্শিতে নিজের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি প্রতিনিয়ত কী পরিমান রক্তস্রাব ঘটায়। সাইফুল্লাহ, স্বাভাবিক আত্মশক্তির কারণেই, সততাকে বরণ করে নিয়েছিল অজানা পথের সঙ্গী, বন্ধু ও পথদর্শক হিসেবে; এবং সে জন্যেই তাকে বিনিময়ে দিয়ে যেতে হয়েছেও প্রচুর, শেষ পর্যন্ত নিজেকেই। সে একজন সচেতন কৃষক যে ভাঙনের বিরুদ্ধে লড়তে-লড়তে ভাঙনের জলেই ভেসে যায়, আর তার ফলনকে ঘরে তোলে বা ফলনের স্বাদ উপভোগ করে আমাদের মতোই অন্যেরা।

*‘ স্বপ্নশরীর, ছোঁবো না কণামাত্র নপুংসক মাটি*
*ছোঁবো না পরাধীন সুষমা,*
*নগ্ন হয়ে দেখাই রূপান্তরিত জন্মরূপ*
*পরান্ন প্রবাসে এই অধিকার । ’*

মাথার ওপরে চাঁদ বা মেঘ, পায়ের নীচে অনুর্বর তাবু, কর্ষিত ক্ষেত, শরীরে খরার সংবাদবাহী হাওয়া; এইসব স্বদেশের, স্বজাতির, স্বজনের নিজস্ব ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা কখনো আনে ক্লান্তি, পরাজয়ের বোধ বা গ্লানি; তবু চলার দুঃসাহস কিছুতে থামে না। কখনো নিজের চুল ছেঁড়ে নিজে, মাথা ঠোকে পাথরে, নিজের বিরুদ্ধে নিজে চীৎকার করে ওঠে ক্রোধে, আত্ম- উন্মোচনের অসহ্য ক্রন্দনে। সুনীল সাইফুল্লাহর কবিতা ধারণ করেছে, এমনি বিস্ময়কর, কখনো কখনো অনিবার্যভাবে পরস্পর বিরোধী জগৎ, শারীরিক পঙ্গুতায়, অসামর্থ ও লালিত্যে । সার্থকতা বড়ো কথা নয় ; কতোটা সততা ধারণ করতে পেরেছে তার কবিতা, সেটাই বিচার্য, ভেবে দেখার। তার অকাল মৃত্যুর জন্যে দুঃখ নেই, কর্মের অপূর্ণতার কারণে।

*‘ শ্রেষ্ঠতম উন্মোচন হবে আজ।’*

এই উন্মোচন, বেঁচে থাকার জন্যে যে সংগ্রামের প্রয়োজন, তার। আমাদের জন্যে রয়ে গেল, সাইফুল্লাহর কবিতা, মৃত্যুর বিরুদ্ধে তার রুখে দাঁড়াবার অদম্য অনুপ্রেরণা ও প্রয়াস। অনিবার্য কিন্তু স্বাভাবিক ও সাধারণ বলা যায় প্রায় গতানুগতিক ক্ষয় ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম যতো দীর্ঘজীবী হয় ততোই প্রসারিত হয় আমাদের উত্তরাধিকার। সাইফুল্লাহর মধ্যে এমন একটি সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও জাগরণের প্রত্যাশা ও প্রত্যাশার উদ্‌গম পেয়েও হারালাম। সেখানেই আমাদের দুঃখ ও দুঃখবিনাশী অনুরনণ।

*‘ফুটপাতে গলিত সংসার অন্ততঃ স্থিতিহোক সামান্য চলায়/সঞ্চিত হোক কমলাগন্ধ, কচি লেবু পাতায় প্রভাতী সুর্যের সৌরভ।’*

দীর্ঘায়ু হোক তারঁ বেঁচে থাকার আত্মধ্বংসী প্রয়াস, তার কবিতা। তার কর্মই বহন করুক তার পিতৃপরিচয়, শোধ করুক তার জন্মঋণ।

**মোহাম্মদ রফিক**

## ১.

চলে যাবার সীমারেখায় আজ বৃত্তায়িত সবকিছু,
আর একটু ভালো করে দেখে নিই আকাশ, সূর্যস্তি- সুর
নিথর পানা পুকুর, বৃত্তায়িত আনন্দস্বরূপা উন্মোচিত রাজার পুর
খেলাঘরে কার কন্ঠহার পড়ে আছে নিরবধিকাল
সেই পরিচিত খুঁজে খুঁজে শেষাবধি আজ দাঁড়াতে হবে পুনর্বার
হিম কুটিরে টেমির অন্ধকারে- কুনির্শ করি ছেঁড়া মাথায় রেখে
মর্মরহাত
এবার তো প্রস্তুত রথ, ওঠো জয়দ্রথ;

পেছনে রেখে যাই অযোগ্য শরীর, আর কিছু নয়
শিথিলতায় স্তব্ধ শ্বাসরোধী গ্রাম, একজন্ম কুকুরী- কোলাহলে
নিমগ্ন থেকে তুলে আনি এই অমৃত- পাত্র, রক্ত ঢালো স্বেচ্ছাশরে
মুক্তি পাবে, বৃত্তায়িত জন্মবন্ধন পাপিষ্ঠ আকুতি
পিতৃপরিচয় মুছবো বলে শেষাবধি মুছি নিজেকে-
নিস্তব্ধ আবর্তনে নীলাক্ত শিশু, পরাধীন শপথ
এবার তো প্রস্তুত রথ ওঠো জয়দ্রথ;

এতোদিন সকল জাগরণে জ্বলন্ত খুঁড়ি মাটি ও পাথর
নীচে তার বয়ে যায় আজো ফনাবিদ্ধ আগ্নেয় সাগর
একটু শুই পারলে উঠবো না পারলে এই শেষ
চুমু নাও ক্ষমাশীল মৃত্তিকা- মহাদেশ-
সামনে ক্রন্দনশীলা পথ
এবার তো প্রস্তুত রথ ওঠো জয়দ্রথ।

১৯৮১

## ২.

জন্ম শুদ্ধ হও মাটি অগ্নিকোণে মাথা রাখি বর্ণমালায়
নিশুতি প্রপাতে নিয়মবদ্ধ ধনুক রুখে দাঁড়ায়
নীল প্রদীপে এ জন্ম ছোঁয়াবো, উর্দ্ধঅধঃ বিস্তৃত হও অগ্নিকোণে-
গার্হস্থ রৌদ্রছায়ায় স্থানরতা ভাসে পদ্মস্বরূপে
বিচ্ছুরিত আলোয় ক্ষয়শীল মিশে আছি পাদমূলে,
বাঁশি বাজে দিগন্ত চূড়োয়, শেষ জর্জরিত সকাল প্রক্ষিপ্ত
আকাশে আকাশে
স্বেচ্ছা- বিনাশে পাপমোচন করে যাই জন্মে জন্মে,
ব্যথাতুর নীলিমাশোভা
একদিন শৈশবে ফিরে যেতে ফিরে আসি ব্যপ্ত অনাহারে
বিষ- সংসার ফেনায়িত মধ্যরাতে গেলাশে গেলাশে
আর কতো খাবো মর্মর নিশীথ; ধাতব নীহারিকা
কতোটা ধরে রাখে প্রতিচ্ছবি পৃথিবীর সেই সমাধানে
অনন্ত খননকার্য সর্বদা নমিত রাজ্যসীমায়, নবজাতক- নমস্কার
রঙে রঙে ভাসমান তটভূমে, আলোছায়া বাসঘরে
বিদায় নিয়ে চলে যাই শেষ মানবিক সূর্যোদয়ে
এরপর সকল পিষ্টতায় কেবলি নৃত্যভঙ্গিমা জাগে-
এ জন্ম মিথ্যে, সত্যমুকুট ছাড়া একদিনও বাঁচবো না আর
পাপিষ্ঠ পূণ্যপটে রেখে যাই শেষ অহংকার।

১৯৮১

## ৩.

মাটিতে মাথা ঠুকি জাগো হে পূণ্যপিতা, করতল প্রত্যহ
ছড়াই মহাকাশে অগ্নিশুদ্ধ জন্মভূমি দাও দগ্ধ লোকালয়ে
এ জন্ম নেবো না, আমার আদেশে একতিল নড়ে না নিয়ম
ছলনায় সম্বৃত মন্দির, পুরোহিত পোশাক ছিঁড়ে ফেলি
অনন্ত নগ্নতায়
ভেতরে কোন, রাজা নিমগ্ন সাজায় রাজ্যপাট আমি জানি না
আমি তো বহুদিন বাইরে আছি, ঋতু পরিবর্তনে নিরবধি
মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভেসে যাই সম্বৃত জলধারে
পবিত্র নীলিমায় এটুকু পচন দু হাতে লেপে যাই এভাবে
সম্ভব্য মাটি
আমি তো ভরাট তলপেট ছোঁবো না, ভেতরে আলোকধারা
কতোদূর যায় সংলগ্ন অঙ্গশীল ছায়াজন্ম জানে সেই ফুল্লপিপাসা
মাটিতে মাথা ঠুকি জাগো হে পূন্যপিতা
সব শব্দ প্রলাপে ডোবে, শ্রবণ ছেঁড়ো আজ অগ্নিশলাকায়
ক্রমশঃ অপসৃয়মান তিনটি তারার উৎসভূমি খোঁজে এই রাত
ওই অলকায় মায়াবী আলো, শব্দহীন জলপ্রপাত-

উর্দ্ধমুখী অমৃতপানে সিক্ত সন্ন্যাসী বসে থাকে বনভূমে
তার জটাজুটে কাঁদে নবজন্ম, ফুল্ল- পৃথিবী- যোগ্য তলপেট
মানুষের নেই
পথে পথে এই প্রণয়ী ধুলোর অভিশাপ।

১৯৮১

## ৪.

মৌনব্রতে বুদ্ধের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে পর্বতমালা
পাথুরে নির্ভরতায় অমোচনীয় মুখভঙ্গী অমরতা চায় উর্দ্ধপানে-
সুন্দরী অন্তর্গত উজ্জ্বলতায় মিশিয়ে নেয় হিম চরাচর
উচ্ছিষ্ট পড়ে আছি একটি মানুষ চৌচির মাটির ভূড়ি উচুঁ হয়
কিসের নিয়মে, পাপিষ্ঠ প্রবাহে- অঙ্কুরিত আত্মজের ভয়ে
আত্মহত্যা করে একজন তার ব্যর্থতা ঝরে চন্দ্রালোকে
বাঁচিয়ে রেখেছে বৃক্ষ, মানুষ নয়; ভুলে যেতে হবে এই ক্লিষ্ট পরবাস
সুন্দরী অন্তর্গত উজ্জ্বলতায় মিশিয়ে নেয় জল, আমি তো মানুষ ছোঁবনা
বৃক্ষ ছোঁব- এই করুণায় ছায়া- বসবাস জলে স্থলে;
নদীর ওপারে অন্যদেশ ওই আমার জন্মভূমি একদিন যাবো
ততদিনে তৈরী হোক ময়ুরপঙ্খী একদিন নিশ্চিত চিঠি আসবে রাজার
নদী তীরে যাওয়া আসা দৃশ্য দেখা ওপারের, ডিঙি নৌকোয় পারাপার
ছিলো একদিন আজ পঁচিশ বছর পাঁচশ জন্মের ভার
ওই যে দেখা যায় আকাশের গায় মন্দিরচূড়ো ওই আমার শৈশব
কী মন্ত্র পাঠ করো পুরোহিত সুর্যোদয়ে
শৈশব ঘোঁচে তার স্বপ্ন ঘোঁচে না-
অপরাধহীন এই পাপ মোচন জন্মাবধি
আদেশমাত্র পালন করি দাসখত প্রতিবার
শরীর বাজী রেখে বলেছি আমি কতোটুকু কবি
এবার ছুটি চাই ঈশ্বর।

১৯৮১

## ৫.

যাত্রাপথে কে দাঁড়াও অপ্সরী-  এই মায়ায়
চিরকেলে মুর্খ আমাকে সামন্ত- আকাশে করতে হয় কৃষিকাজ
দ্বীপান্তরে যাবো; কেঁপে ওঠে নীলিমা প্রকৃতি স্বপ্নলোকে,
রৌদ্রছায়া হিম লোকালয়, রঙীন সুন্দরী- স্রোতে চলমান অলস দ্বিপ্রহর
অসময় বৃষ্টিধারায় শীতার্ত মাটির গন্ধে হেমাঙ্গী দ্যুতি ছড়ায় অপ্সরী
এইদিনে কতোটা বঞ্চিত হয়ে আছি তার ইতিহাস লিখে নাও আকাশ;
যাত্রাপথে কে দাঁড়াও সাবিত্রী, দ্বীপান্তরে যাবো
এই মুখই আমার ঈশ্বর ভেবে যে মানুষ
প্রতিটি অনিরুদ্ধ পচন মাংসচেরা হিমস্রোতে কম্পমান
তাও তুলে নেয় সংসার করতলে, অনির্বান বিলয়ে কাঁদে জন্মাবধি
তার নাম আমি;
যাত্রাপথে কে দাঁড়াও রেবতী, তুমি তো নদী
তীরে তীরে বোধিবৃক্ষ মোর-
কতোদিন নরকবাসের পর মারীচ- সুন্দরী নাচে একবার
তার ইতিহাস লিখে নাও আকাশ,
যাত্রাপথে কে দাঁড়াও জননী, দ্বীপান্তরে যাবো
সারারাত জলপ্রপাত বৃষ্টিশব্দ কুড়েঘরে,
আধো অন্ধকারে
তবু জীবনের বাষ্প ওঠে, কী সুন্দর চলছে সংসার আমি
মিছেমিছিই দুঃখ পাই-
আমার অন্ধকারে কেউ বুঝি কাঁদে ছায়াবৃত রাতে
তার স্বরূপ বুঝে নাও মাটি একটি বৃক্ষ জন্ম দিও।

১৯৮১

## 6.

মধ্যরাতে নিয়ম ভেঙে যায় কয়েকটি মানুষের
শ্বাসকষ্ট, উন্মুক্ত ছোটাছুটি ঘর্মাক্ত পথে ঘাটে দৃশ্যমান
প্রতিটি মানুষ শববাহক; চিত্রপটে আগুন লেগেছে
যে যেখানে আছো বাঁশি বাজাও, নৃত্যপর হিংস্রতা ভোলে বংশ পরিচিতি
কামড়ে আছি মাটি স্বেচ্ছায় তুলে নেবো-
সমস্ত দিন আহার্য অন্বেষণ শেষে সন্ধ্যায় ফিরে আসি ভেতরমহলে
প্রদীপজ্বালা গুহাগাত্রে প্রাণপণ আঁকিবুকি
এখানেই লুকিয়ে আছে পিতৃপরিচয়- পাঠোদ্ধার ছাড়া
আমার তো হবে না যাওয়া আলোকধামে
দাঁতে ধরে আছি জন্মমৃত্যু সমাহার
পাহাড় প্রদেশে বর্ণালী ডিম, ঝংকৃত সাগরজল আমার আহার্যে
নিত্য এতো সুন্দর কেন আসে
অনাহারী মৃত্যুপণে দাঁতে ধরে আছি বৈনাশিক মাটি ও পাথর
শেষ যাত্রার আগে এমনি প্রগাঢ় নেশাপানির ব্যবস্থা হবে জানলে
মৃত্যুশয্যায় আমিও থাকতাম শুয়ে জন্মাবধি
শেষ দৃষ্টিপাতের নিপূণ বর্ণনা শুনেছি পিতা, তুমি নিশ্চিত হঠাৎ
জেগে উঠেছো কবরে, শ্বাসকষ্টে আবার নতুন সমাধিফলক
নিষ্পলক জাগে পার্থিব অবয়বে; সংসার- সম্পৃক্ত মৃত্যুশয্যা
জ্বলমান আকাশে আকাশে-
তোমার মৃত্যুদিন ছুঁয়ে থাকে আমার সর্বদিন
রাজত্বভারে অসমর্থ মুক্তি দাও মহারাজ।

১৯৮১

## ৭.

শ্রেষ্ঠতম উন্মোচন হবে আজ-  এসব নদীতীরেই মানায়
সারি সারি রিক্ততা ও হিম সমারোহ, ভেতরে স্রোতধারা-
জন্মের অক্ষরে অকম্পিত চিত্রলিপি ছোঁয়াচে চুম্বনে অবিরত
খোঁড়ে আমুন্ডু ব্যর্থ অহমিকা, এক জীবনে লক্ষ জীবাণু সংক্রমণ
তাদের যৌক্তিক খাদ্যসংস্থান রাত্রিদিন অভ্যাসবশে
পালন করি জন্মনফর- আপন শরীরেএইসব আত্মভূক্ত কৃষিকাজ
প্রথম শ্যামশ্রী নদীতীর পেরিয়ে আসার পর
শুনেছি সামনে দেখা যাবে অনন্ত তরমুজ ক্ষেত, ছোট্ট চালাঘর
সর্বশেষ আত্মদহন শেষে শেষ অগ্নিবিন্দু পান করে যাই
কৃষ্ণের কথায় প্রবোধহীন অর্জুন আমি প্রতিটি বাহ্যিক হত্যায়
হত্যা করি নিজেকে,
আমিহীন কিভাবে চলবে সংসার তার দায় নাও উন্মোচিত অন্ধকার
আমি যাই এই সত্য ললাটে শেষ রাত্রির চাঁদ
হিম- আক্রোশে ছড়ায় হননেচ্ছা ঘরে ঘরে-
বেঁচে থাকা মর্ত্যমুখী আততায়ী আকাশে
সপ্তর্ষি সীমারেখায় অবোধ্য কথাবার্তা অশ্বখুরে অতিষ্ঠ
স্ফীত উদরে নামে অনিবার্য জন্মধারায়-
বর্ণালী উৎসবে প্রাত্যহিক প্রণতি বিশ্বাসঘাতকের
ভেঙে পড়লো আজ অপরাহ্নে ক্ষয়রোগী আলোর শবাধারে
শ্রেষ্ঠতম উন্মোচন হবে আজ-  শেষাবধি এটুকু পুরস্কার
ফেলে যাবো তুচ্ছ বসবাসে ক্ষয়শীল মাটি ও আকাশ;
মাংসজ গভীরে আন্দোলিত ফুলমালা, কোনো অঙ্গেই আমি
পৌঁছুতে পারি নি অতদূর, ওই পাপড়ি আবর্তনে
প্রাত্যহিক  সূর্যোদয় ও আলোকসংক্রমণ বিলয় অবধি-
অনাথ সংসারে মাটি স্থির দাঁড়াও।

১৯৮১

## ৮.

আত্মহত্যার আগে শেষকথা কী লিখে যাবো এই প্রশ্ন
করে শেষ রাত শেষ আকাশ মাধুরী; শেষকথা কী বলে যাবো
সেই ককর্শ বিদ্যুৎ সর্বশরীর ঢেকে আছে, মেঘাচ্ছন্ন দিন-
কাঁদে বাসভূমি, ছিন্ন চালাঘর

সাম্রাজ্যশাসন কোনদিনই হবে না আমার
মাঝেমধ্যে যেটুকু দায়িত্ব পাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাই
অলস নিয়মকানুন, ব্যভিচার, দিগন্ত ছোপানো ভঙ্গুর মায়াজাল;
আশৈশব অনিবার্য অনাচারে আনত শরীর ভাসে
শীতকালীন শীতলক্ষ্যা- স্রোতে, সময়ে পঁচে, মেশে নির্বিকার
পবিত্র জলে-  জন্ম কেন কথা বলে চোখে এই বিরোধ
তীরে তীরে কম্পমান হিম সংহারে, মর্ত্যধারায়;

আত্মহত্যার আগে শেষ চিত্রলিপি কী দেখে যাবো
এই প্রশ্ন করে জন্মভূ, নগ্ন হয়ে দেখাই রূপান্তরিত জন্মরূপ
বিকলাঙ্গ- প্রবাহে শিথিল যৌনাঙ্গ- বিষ, শৈশবে অমল প্রাসাদে
দায়িত্বহীন রাজত্বসুখ, স্বপ্নসন্ধ্যায় বয়ে যায় সুর্যাস্ত সুষমা
বুকে হেঁটে শেষাবধি এই নদী তীরে, অনাদি মায়াকানন
এখানে একটু বসি যাবার আগে শেষ দেখি রঙে রঙে কতোটুকু
কম্পমান স্বপ্নশরীর, ছোঁবো না কণামাত্র নপূংশক মাটি
ছোঁবো না পরাধীন সুষমা, নগ্ন হয়ে দেখাই রূপান্তরিত জন্মরূপ-
পরান্ন- প্রবাসে এই অধিকার।

১৯৮১

## ৯.

এই রাত ভুলে গেছে সমস্ত সোহাগ
গার্হস্থ আলোছায়ায় প্রতি সন্ধ্যায় সৃষ্টির যাবতীয় করুণ
স্যাঁতসেঁতে ঘরে তারা প্রদীপজ্বালা তার নরোম হাতে
নৈসর্গিক ক্ষতচিহ্ন কাঁপে অনিবার্য জন্মধারায়-
উত্তরে ধাবমান তুষারজল ঢলে ভাসায় ফসলিয়া দক্ষিনাঞ্চল,
দেবীমূর্তি-
মানুষজন্ম ছেড়ে স্বেচ্ছায় উথালপাথাল বিবর্তনে এই আশ্বিনে
মেঘাভ্র উদারতায় করজোড়ে চেয়ে নেবো কুকুরীজন্ম-
বিদায় বেলায় ক্ষতচিহ্ন কাঁদে চৌকাঠ, মর্মর দেয়াল
কতো আর মায়ায় লেপ্টে রাখি ভঙ্গুর দৃশ্যপট বাহুমূলে
কতোবার ফিরে ফিরে যাবো, নীলকন্ঠ আগুনে জ্বালাবো
ভেতর বাহির
প্রাকৃতিক আলোছায়ায় অবিমিশ্র তৃণভোজী মাটি ও আকাশে
পদসংক্রমণ
নৃত্যপর বাউলের একতারায় টুকরো টুকরো বিরোধী বিশ্ব
একীভূত সংগীতে বেজে ওঠে অন্তরীক্ষে ও অন্তঃজ জলে
মনে হলো মিশে যাই তার অবিনাশী একতারায়
তার আগে মানুষজন্ম এই কুকুরীজন্ম।

১৯৮০

## ১০.

এই ঝড় বজ্রপাত মাটির মমতা এমন ঋদ্ধ কিছু নয়
নিদ্রাহীন এপাশ ওপাশ
আপন মাংসের পচাঘ্রাণে অস্থির
রাত্রি দ্বিপ্রহরে আমার দরোজায় সেই হিংস্র পদাঘাত,
ঘরে রাত্রি- স্ফিংকসে সওয়ার হয়ে আসে সম্রাট চাঁদ-

নিঘুর্ম রাতে রাত্রির অনন্ত প্রলাপে জলরাশি ফুঁসে ওঠে
মহাপ্লাবণ, অলৌকিক অগ্নুৎপাতে,
আমি তো সৃষ্টিতে চিরকাল ধরে আছি সংহার
ভেতরে কিছুটা গম্বুজ সদৃশ নির্মাণ এর নাম জন্ম নয়
শব্দহীন বিষন্ন বিকেলে অপার্থিব পাতা ঝরে
অনুতাপহীন নুয়ে পড়ে শাখা, বটের সাথে শুধু
শৈশব মিশে আছে, না যৌবন না জীবিকা-
গতকাল মাঝরাতে চাঁদ খসে পড়তে দেখেছিলাম দক্ষিনে
তাহলে কী সাগরেই পড়েছিলো যৌনতাড়িত হীন জানোয়ার?
দক্ষিন বাতাসে বিষ এতোদিন জানতাম ওদিকে সাগর

আমি জানি এই শুয়োরের চক্ষুখচিত অঘ্রাণের রাতে
কেউ ঠিক ঘুমন্ত আত্মজের গলায় বসিয়ে দিয়েছে ছুরি
আমি ব্রহ্মান্ড জুড়ে প্রবহমান রক্তের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছি।

১৯৮০

## ১১.

অনঙ্গ কন্ঠস্বরে জেগে ওঠে ছবি, চেয়ে দ্যাখো পটচিত্র রাত্রির-
দিনরাত্রি পরিবর্তনহীন, বিকলাঙ্গ অনড় সময় আমার কাছেই
দয়াভিক্ষা চায়
শীতের শেষ এবারে কুহকী বসন্ত মুখশ্রী ও শারীরিক লাবণ্যে
ভুলিয়ে আমাদের নিয়ে যাবে এক সর্বব্যাপী যৌনতায়-
ফণাকীর্ণ আন্দোলনে সুপ্ত ঝড় তার চরিত্র বুঝে
বাঁধো ঘর শ্যামছায়া নদীতীরে,
বড়ো প্রয়োজনহীন আমার হাত, শিল্পসুষমা
মায়ের বুকে খাদ্য ফুরিয়ে যাবার পর মাটি খোঁড়াখুড়িতে মত্ত হয়ে
আছি

এ দেশে গ্রীষ্মের পর দীর্ঘায়িত শাদা মেঘের ভেলায় ভাসা শরৎ
এই নিরুদ্ধ অনুভবে মৃত্যুজরা যাবতীয় নিয়মহীন
অধিকার করে আছে ব্যক্তিগত সামান্য আকাশ-
সাত সমুদ্রে সাত বছর ডুব দিয়ে থাকলে ও ধুয়ে যাবে না আমার
অপরাধ

আত্মঘাতী রক্তে জলকেলী শেষে দ্যাখো মর্ত্যে বাতাসে
খ্যামটা নাচে মত্ত শারদলক্ষ্মী
তবু নিস্ফল মাটি খোঁড়াখুড়ি চতুর্ধারে - মানুষের হাতে
সত্যশিল্প নেই
তাই সাধের শৈশব শেষে তার জন্য আর কোথাও নেই মাতৃস্তন
এ দেশের শ্যামলী মাটির বুকে কোথাও জেগেছে ফাটল-
পোড়ে জীবিকা যৌবন, রাধার নীলবসন, আগরবাতি- শৈশব,
জ্যৈষ্ঠজীবনে বহুকাল পরবাসী হিমানী হাওয়ায় মাংস ছুঁয়ে দেখেছি
জাগে না ঈশ্বর, ফুল ফোটে না-
আমি তো জল, শুধু জল, পরাধীন, চাঁদের বন্দী।
১৯৮০

## ১২.

আত্মহত্যার আগে আমার নিঃশ্বাসের আগুনে ক্ষয়িষ্ণু
একদিন উৎসব হবে আলোছায়া আমলকি বনে,
সমস্ত ক্রন্দনের উৎসভূমি ছুঁয়ে প্রবহমান নীরব নদীর ফুঁসে উঠলে
দুকুল
যেখানেই থাকি ফিরে আসবো,
খরস্রোতে অন্ধকারে টালমাটাল জীবন প্রতিবাদহীন ভেসে যাবে
বৈনাশিক নিথর প্রবাসে তার আগে সমস্তই ধুলোখেলা-

কিছুদিন কাঁধে নেবো রাজ্যভার, কী ভেবে আমাকেই যে
উত্তরাধিকারী
মনোনীত করলেন রাজা বুঝি না মাথা মুন্ডু তার
দিগ্বীজয়ী মহারাজের অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত স্বদেশভূমি
পার্থিব উপঢৌকনে তাকে তুষ্ট রাখার রীতিনীতি শিখিনি কিছুই
তবু কী এক ক্রন্দনে বাঁধা পড়ে আছি
হাহাকার শুনলেই ফিরে আসতে হবে-
রাত্রির মাই চুষে সৃষ্টির সবটুকু আঁধার পান করার নেশায়
একজন নির্বাক বসে আছে জন্মাবধি, সে যতো পান করে আধাঁর
জন্ম দেয় তারো কিছু বেশী,
বসন্তদিনেও আদিগন্ত সাগরতীরে ঘনভার মেঘ ডেকে যায়
কার আকুল কান্নার ধ্বনি জেগে ওঠে অন্তরীক্ষে, চিড় খায়
অনন্ত আকাশ-
কী রাজমুকুট পরবো এ দেশে, ভুল অঙ্গীকারের মার্জনা চাই রাজা
জন্মে নিয়েছি দেহভার বসবাসে যদি অবধারিত রাজ্যভার
তবে পিষ্ট হবো পাথরে-
রাজা তোমার উত্তরাধিকার ফিরিয়ে নাও।

১৯৮০

## ১৩.

এই বিষাক্ত দাঁতাল বিকেলে আমি পরিত্যাগ করি সবকিছু,
পরিত্যাগ করি বসনভূষণ মানবিক সমূহ অলংকার
দাঁতে টুকরো করি বাসভূমি, শরীরে শরীরে ঘর্ষণে
যতোটুকু উষ্ণতা ও আলোক সংক্রমণ সেই চন্দ্রাতপে জাগে
হিমসংহার অদিতি- উৎসব-

জন্ম যদি নেই তবে আর প্রয়োজন নেই শুদ্ধসত্ত্ব কুমারীর
এতোসব পিপাসার্ত দুপুর আসে
সমস্ত প্রলয়ের পলিমাটি ইচ্ছাধীন জন্ম দিয়ে যাই
অনুর্বর মাংস ও মাঠে সকল জৈবিক বৃদ্ধি সাংঘাতিক স্থির হয়ে আছে-
গোলাপের মাধুরী- অঙ্গে আমি আছি কিবা নেই তার সমাধানে
বৎসর বৎসর অর্থহীন কোলাহলে মাটি ও মেঘের অন্তর্বতী বাসভূমি
কামে ঘামে ও রক্তে একাধারে পাথরও উর্বর করেছি,
লাস্যময়ী রাত্রি- পতিতার করুণ বুকে ও বৃষ্টিধারায়
নতজানু, বসতে গেলেই সকল সৃষ্টি পথে তাম্ররেণু
খরা ও বিষে জ্বলে যায় ভুবনপুর-
জীবনভর একগাছি দড়ি খোঁজার জন্য আমি রেখে যাবো না বংশধর
পরিত্যাগ করি বসনভূষণ মানবিক সমূহ অলংকার
দাঁতে টুকরো করি বাসভূমি, মাতৃজঠর;

এই চামড়াছেঁড়া উন্মাদ বিকেল কম্পমান লালার্ত জিভে
চেটে খায় বসবাসে অপরিহার্য অনাদি অহংকার-
এদেশে ওদেশে চিত্রিত পুতুলনাচে উল্লসিত দর্শক নির্বিকার
ভূলে থাকে জন্মের উৎসধারায় কম্পমান সংহার পিপাসা
প্রতি অঙ্গ নাচে অবুঝ ইচ্ছাহীন, অপরাধহীন আকর্তিত মাটি
দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে উদ্ধগিত হুকুমনামা কুকুরীজন্মে;
গোখরা- চোখ পেঁচা তামাটে জিভে ঠুকরে খায় সুর্যালোক
তারায় তারায় উদ্‌ভ্রান্ত রশ্মিধারা
প্রতারক আলোর চেয়ে ঢের ভালো বিশ্বস্ত আঁধার।
১৯৮০

## ১৪.

প্রহরী জেগে আছি, সারারাত শব্দ শুনি রাত্রির-
এতো নির্লজ্জ করুণ মায়ায় ছেয়ে আছে চারিধার
যাবার আগে পেছনে তাকিয়ে এই অনন্ত অশ্রুপাত জেনো এ শুধুই
নিয়মরক্ষা, একাকী যাবার পথ নির্দয় নখরে চিরদিন প্রশস্ত রেখেছি-
রোজ সকালে দৃশ্যমান সকল আকাশ তীব্র রোষে ফেটে পড়লো
লোকালয়ে
যেন আমি এখুনি মুন্ডুপাত করেছি সুন্দরীর-
মানবিক অহংকারে মুহূর্তকালও বেঁচে যেতে চাই ধ্যানভঙ্গ নির্মোহ
ঋষির
কী নামে জাগাবো তাকে, তেমন মেনকা কই,এতো পরিশ্রমে
সাধনায়,
চিরকাল ক্রন্দনে জেগে আছে মাটি তার মঙ্গলঘটে শঙ্খসুরে
অপ্সরীজন্ম দিতে পারে না কুটিল রমণীর-
জন্মে যথেচ্ছ বৃষ্টিধারা, ওঘরে প্রহরে প্রহরে ককিয়ে ওঠে কেউ
ওই গোঙানি জন্ম ও চিৎকারে একদিন পাপিষ্ঠ শৃঙ্খল পরেছি আমিও
এতেই শুরু ও শেষ সকল দায়িত্ববোধ-
এই ঘরে কৃষ্ণাভ বসবাস আমার, অবিরত মাংস খুড়ে- খুড়ে দেখি
কোথাও জ্বলছে কিনা তারাস্রোত নাকি শুধুই জড়তা
ইটপাথরে ঋদ্ধ পিপাসায় ও তীক্ষ্ম জলধারে কর্তিত বিনাশে
বেঁচে আছি অনড় নিয়মবদ্ধ আবর্তনে-
পথ ও পান্থশালায় কোনো তফাৎ নেই একথা বলতেই
চলে গেল পঁচিশ বছর আজ প্রান্তিক মাটি ও জড়তার শেষ সীমা
প্রহরী জেগে আছি শ্রবণে ক্রন্দনে স্বনির্মিত মাটির সংগীতে
রাত্রিদিন সাজাই ধুপবাতি মঙ্গলঘট-
জন্ম বসবাস পার্থিব সমস্ত কিছুতে হাহাকার করে ওঠে
ব্যর্থ অভিমান।
১৯৮০

## ১৫.

কাল রাতে একটা তারায় আগুন লেগেছিলো।
দু গেলাশ তারার ফুলকি পান করে
সারারাত নিদ্রাহীন
চিৎকারে চিৎকারে চৌচির ফাটিয়েছি
কার্তিকের গর্ভিনী ফসলের মাঠে
হে রমণী বৃক্ষ নদী
দ্যাখো দ্যাখো আমার আর কোনো পিপাসা নেই।

মাংসের কারাগরে পিঠমোড়া বাঁধা কোথায় লুকিয়ে থাকে
পদ্মপ্রেম- তার সন্ধানে শিশ্নাঘাতে যারা অনবরত
রক্তমাংস খোঁড়ে
তাদের কান ঘরে টেনে এনে দেখিয়েছি আমি
এক ঘুমের পর মানুষের মুখের দুর্গন্ধে
দাম্পত্যশয্যায় কুষ্ঠজীবাণু আর চৌচির মাটির মাতাল শূঙ্গারে

কাল রাতে একটা রজনীগন্ধায় আগুন লেগেছিলো
আমি দু গেলাশ জ্বলন্ত ফুলের শরবত পান করে
ভোর হবার আগেই পৃথিবীর সমস্ত পানপাত্র ভেঙে
চলে এসেছি সামুদ্রিক কঙ্কালদ্বীপে যেখানে
একটি মাত্র হাড়ের আঘাতে
তামাম সৃষ্টির বোঁটা ছিঁড়ে
ফোটায় ফোটায় রক্ত ঝরে-
আমার আর কোনো পিপাসা নেই।

## ১৬.

সমুন্নত শিলালিপি ডোবে আকাশমন্ডলে, দিগবিজয়ী রাজার
অভিযান কাহিনী গিলে খায় দিনাবসান, সূর্যাস্ত- দুঃখ;
একজন্ম দায়িত্বহীন জীবনধারায় কম্পমান মাটি চৌচির ফাটে
গুরুর দীর্ঘ শ্বাসে, এতো জল ধরে কোন মহাকাশ
অতদূর হাত ওঠে না আমার, আজন্ম-একাকী অস্তিত্বধারায়
অবগাহন শেষে আমৃত্যু থাকবো নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে, দূরগামী
দর্পিত দেশ;
এলোমেলো পৈতৃক ভিটের ঘূর্ণমায়া কাঁপায় আলোকময়ী
মাংসজ প্রতিমা
উষ্ণ পেলবতা ডোবে আকাশ মন্ডলে-
দিগবিজয়ী রাজার শিরস্ত্রাণ, প্রতিকণা কম্পমান ব্যপ্ত জলধারে,
সীমাহীন অঙ্গুরি এই একদিন নির্বাক ছোঁয়াবো মর্মমূলে
এটুকুই স্বেচ্ছাচারী সাহস মানুষের, পরাধীন জন্মে স্বেচ্ছামৃত্যু
এই অধিকার
ভরণপোষণে অপারগ চতুর্ধারে তার জন্মবধি জেগে আছে
দয়ার্দ্র উর্দ্ধলোকে ভিক্ষাপ্রার্থী কৃষিকাজ-

এতোবেশী দায়িত্বশীল তবু, হতে হবে আমাকে, বিস্ফারিত ও
সিক্ত সব
নির্ভরশীল মুখমন্ডল, মুখ তুলে চেয়ে আছে সর্ববিধ অন্নদাবী,
পাপিষ্ঠ লগ্নতায় কিষ্ট শরীরভার, সমর্পণযোগ্য মহাজীবহীন
ভিক্ষাবৃত্তি জন্মে জন্মে- পূর্বপুরুষের পাপমোচন-
বড়ো সংলগ্ন হয়ে আছি জন্ম ও জরায়
তোমার আসরে আর ফেরা হলো না গুরু।

১৯৮১

## ১৭.

শেষ রোদ্দুর, ক্রন্দনশীল মেঘে মেঘে একটু দাঁড়াও
আমারও সময় হলো যাবার-
কম্পমান মাটি ও সংসার;
মৌসুমী হাওয়া
সুপ্তিমগ্ন জলীয় প্রবাহ সাগ্রহে ভাসায় উৎসমূল
মেঘে মেঘে মুন্ডু রেখে আসি, ছিন্ন চলাফেরা-
ছায়াবৃত পার্থিব সীমারেখায় চুল ছড়িয়ে বসে আছে
আনন্দস্বরূপা
পায়ে তার মাথা রেখে বলি খেলা তো শেষ এবার চলি

শেষ রোদ্দুর, নারকোল পাতায় করাঙ্গুলি রেখে যাও প্রতিবার
সূর্যাস্তে সবাই ফিরে আসে কম্পমান মর্মর মাঠে
সটান পড়ে থাকে আকাশ; অপরিহার্য কোনোকিছু নয়
শুধুমাত্র সৌন্দর্য ধারণে ঝংকৃত অবয়র নাচে নীলাঞ্জন- বসুধায়
মেঘাবৃত বসন্তদিনে নিজেকে স্থাপন করি ধারাজলে

নিম্নাংগ নিয়মমাফিক পঁচে, কোমলতায় যে শরীর ছোঁবো
সুস্থ স্বাভাবিক আমি জল্লাদজন্ম সার্থক করি ফুল্ল- স্বরূপে
এতো বৃষ্টি ঝরে মেঘে মেঘে পূর্ব পুরুষ ঋণ তবু ঘোচে না
ছিন্ন পাথরে
উর্দ্ধমুখী পিপাসা সমগ্র মর্ত্য ও মাটির
আমি শুধু দিতে পারি আমার শরীর একাকী পাখির পূর্ণিমা-
পিপাসায়
এর বেশী কেউ কখনো পারে না।
শেষ রোদ্দুর গোলাপী প্লাবনে একবার ভাসাও পাপিষ্ঠ শরীরভার
আমার সময় হলো যাবার।

১৯৮১

## ১৮.

ক্লান্ত দিনের ভারে কেঁদে ওঠে মাটি-
এখুনি আমার সরে পড়া সঙ্গত কিনা সেই উত্তর খুঁজে বেড়ালাম
আজ সারাদিন নম্র বৃক্ষমূলে, মুমুর্ষ বাসরঘরে,
সারাক্ষণ ঠোঁটে আগুন জ্বেলে রাখা জরুরী
আমি তো যাবো ভেতরে নাচঘরে-
নুপুরধ্বনি শুনে কতোকাল আর তুষ্ট থাকবো রাজা ?
শব্দ দৃশ্য পরে স্পর্শ পর্যায়ক্রমিক এই লোভে নুব্জ দেহে
তাও বেঁচে আমি- আমার সব নির্মাণ আজ ভেঙে এসেছি
নিজহাতে

এবার তোমার অট্টালিকার কারুকাজ দেখবো রাজা;
ভেতরে নাচঘর-- এই পিপাসায় চলমান সংসার
শব্দে তুষ্ট সকলে, আমাকে সব দেখতে হবে ছুঁয়ে--
মায়াবী পর্দার সূচিকর্মে যদি বুনেছো রাজ্যশাসন
তবে তোমাতে আমার কোনো তফাৎ নেই রাজা
মাটি জল স্নেহে বাঁচিয়ে রাখো শরীরে, আমাকে নয়
খন্ডিত বসবাস রেখে যাবো ধুলোয় পচনশীল অবয়বে, ধারাজলে;
বিনিদ্র নির্মাণের ধ্বংসস্তুপে বসে সন্ন্যাসী কাঁদে
সব অর্থহীন মায়াবী অর্জন অনিবার্য মৌনব্রতে গোঙায় সারারাত
ক্রমশঃ অগ্রসরমান জলপ্রপাত শব্দে বিচূর্ণ বাসঘর-
তমসার তীরে নগ্ন শরীরে এই অপমান।

১৯৮১

## ১৯.

দিগন্তে সূর্য ক্ষয়ে গেলে পরে একদিন কেঁদেছি
এটুকুই সৃষ্টি ভালোবাসা- পশ্চিমে এতোটা ক্রন্দন মিশে ছিলো
এতোকাল
ক্ষীয়মাণ ধুপবাতি- সংসার জেনেছে সবটুকু তার
সীমাবদ্ধ মূর্ত অবয়ব দেয় না কিছুই কখনো
কামার্ত রাত্রির ভার সঞ্চারিত দিবসে-
প্রিয় ঋতু পরিবর্তনের দুঃখে গুমোট সান্ধ্য অসীমে বাসন্তী চিত্রপট
সাজিয়ে ভঙ্গুর দৃশ্যমায়া ভাসায় জগত- সংসার
যুগপৎ খরা ও প্লাবনে, সর্বত্র মরীচিকা- ছাওয়া গুহামূল-
সূদূর পাখি জন্মেও কভু পৌঁছোনো যাবে না ঝংকৃত নীলিমাতীরে
নীলজলে নীলাভ নৌকো, রূপালী আগুন ঝরে অবিরত হিম
বেলাভূমে
সুর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এই অপার্থিব দৃশ্যপটে ভেসে যায় পৃথিবী
ক্ষনকাল
সুন্দরীর উপচানো লাবণ্য মিশে আছে সংগীতে সবটুকু
গোলকধারায় কম্পমান যুগল সিন্দুর ঢিপ সুরে সুরে ঝরে
স্তব্ধ চরাচরে- পরিপূর্ণ মিশে যেতে এই শরীরধারণ ও মৃত্যুনিয়ম;
বৃক্ষ ও বাসঘরে এতো পাথুরে ক্রন্দন গোঙায় সারারাত
সেই জর্জর ধমনীমূলে ব্যর্থ মানুষ বসে আছে ক্লিষ্ট তথাগত
নীরঞ্জনা- তীরে
তার অধিকারে সত্যশুদ্ধ সাগরসীমা;
সকল আত্মীয়বন্ধন ছিন্ন মৃত্তিকা- আসনে
একজন্ম নির্বাক বসে থাকা উর্দ্ধপানে- এমনি গতরে নিবদ্ধ সংসার
ছায়াতরুমূলে দুলে ওঠে সাধের জন্মভূমি
আত্মহত্যার উপযোগী ডালে ডালে প্রসারিত স্বপ্নমায়া ফেরে
বৃষ্টিজলে
চিরল পাতা ও ছোট ছোট ফলে তার স্পর্শ লেগে আছে।
১৯৮১

## ২০.

চন্দনকাঠের পালঙ্কে ঘুমন্ত রাজকন্যার নিতম্ব ছুঁয়ে
উঠে আসে করাত বিদ্ধ যুবতী বৃক্ষের যন্ত্রণা-
তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দেখি
জ্যৈষ্ঠের দুরন্ত ঝড়ে পিতামহের নিজের হাতে লাগানো
বকুল গাছের ডালপাতাফুল দুমরে মুচড়ে ভেঙে যাচ্ছে।

বৃষ্টির প্রার্থনায় আশৈশব চুমোয় চুমোয় রাঙিয়েছি মেঘমালা
আজ বুঝি বালি ঝরানো স্বভাব তার।
সারারাত টুপটাপ শিশিরের শব্দে তন্দ্রাচ্ছন্ন
অরণ্যভূমির ভেতর দিয়ে অসি হাতে হেঁটে যায় যুবরাজ
তার জুতোর নীচে শুকনো পাতার আর্তস্বরে
চুম্বনরত দুটো হলদে পাখির যমজ উষ্ণতা
ভেঙে ভেঙে বয়ে যায় জলাঙ্গীর ঢেউ- এর ধারায়।
বজ্রপাতের শব্দে নড়ে ওঠে কর্কশ দাম্পত্যসমেত
ঘরের যাবতীয় আসবার। আমি কোনোদিন
ওর মতো সুখী হতে পারবো না ভেবে
একদিন একটা টিকটিকি খুন করেছিলাম।
হিরণ্যবাহ রমণীর উৎসমুখে মুখে চেপে শুয়ে আছি
ভীষণ পরাজিত শিশু
হে চিত্রিতযোনি, তোমার গর্ভে আমাকে ফিরিয়ে নাও।

১৯৭৯

## ২১.

পৌষের ভোরে বৃষ্টিধারায় কেঁপে উঠলো সারা মাঠ
জানালার পাশে গলিত মুখের ছায়া দোলে, ছায়া দোলে
স্যাঁতসেঁতে ক্ষুব্ধ প্রান্তরে কালো কাফন পরা মেঘের-
মাটির উদরে ছোরা মেরে গেছে একদল উন্মত্ত যুবক গতরাতে
গলগল তপ্ত রক্তধারায় ভেসে যাচ্ছে জনপদ, মানবিক সম্পর্ক।
এতো কালো চোখ ভাবে বাতাসে ?
ঝাঁকে ঝাঁকে শাণিত তাঁর এফোড় ওফোড় করে যাচ্ছে
গর্ভিনীর পেট, গোলাপ অধিক সুগন্ধি কিশোরীর বুক।

আমি আজন্ম চিনি যারে, এই কি সমুদ্র ?
গন্ডুষে গন্ডুষে সবটুকু নীলজল পান করে
কারা পেচ্ছাবে দিয়েছে ভরে মহাজীবন ?
একি দুর্মদঝড় মহাপ্রপাত নিমেষে আমূল ছিঁড়ে নেয় শিশ্নসমূহ ?
জন্মহীন পৃথিবী- পাথর
আমাকে ছেঁড়ো ছেঁড়ো টুকরো টুকরো করো।

এই প্রলয়ে আমি একাই দেখতে গিয়েছিলাম
এক অসহ্য চোখ ধাঁধাঁনো ফাটল যার ভেতরে ত্রিশূল হাতে
ধ্যান বসে আছে সন্ন্যাসী
তার এক চোখ চাঁদ, অন্য চোখ গোলাকৃতি সেই উবে যাওয়া
সমুদ্রের জল
বহুক্ষন বসে বসে হাঙরের লেজ নাড়ানো দেখলাম
তিমির সঙ্গম দেখলাম
শ্বশানে প্রজ্জ্বলন্ত চিতায় হেলেনের শবদেহ দেখলাম
আর কী দেখবো ভয়ংকর
দুহাতে চোখ ঢেকে দৌড়ুতে দৌড়ুতে কদর্য কাদায় পা ঠুকে
আমি আমৃত্যু চেঁচাবো তারস্বরে, চেঁচাবোঃ
জন্মহীন পৃথিবী- পাথর
আমাকে ছেঁড়ো ছেঁড়ো টুকরো টুকরো করো।
১৯৭৯- ১৯৮০

## ২২ .

আমার বুকের ওপরে ছুটিয়ে রাজ্যসফরে চলেছেন মহারাজ
তার পদস্পর্শ পাবার আশায় আমি শরীর ছড়াচ্ছি প্রান্তরময়
তারা খচিত তার উষ্ণীষে ঢেকে যায় বন্যা মহামারী হত্যাদৃশ্য।
ঘোড়ার খুরাঘাতে আমার মাংস ছেঁড়া রক্তধারায় লোহিতাভ
যমুনা কিনারে রাধা ও একশ জন নগ্ন কামিনী স্নানার্থিণী,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছ জীবনের সৌগন্ধ বুকে পাখিরা
উড়ে এসে সারিবদ্ধ বসে আছে মহারাজের গমন পথের দুপাশে-
পাখিদের সৌন্দর্য ও সংগীত একদিন মানুষেরও হবে,আপাততঃ নেই
সত্যশিল্প হবে একদিন,
পার্থিব মেয়ের মিথ্যে মেকআপের মোহ কেটে গেলে
একদা কঙ্কালাকীর্ণ দেখেছিলাম সমুদয় জন্ম,
মানুষের ভাঙাচোরা কন্ঠ ও বাদ্যযন্ত্রের ওপর
পুচ্ছনাচানো পাখির সংগীত ছুঁয়ে ছুঁয়ে
মহারাজ চলেছেন রাজ্যসফরে।
বিনাশ ছাড়া নবসৃষ্টি নেই, তার পদতললীন শুয়ে আছি প্রান্তময়
শরীর ছিঁড়ে ছিঁড়ে আমার মোহন মৃত্যু হলে যদি পাখিজন্ম পাই।

আমি ক্রমশঃ কুৎসিত, আলপিনের মতো প্রখর দাড়িময় মুখ
কোন, কোমলতায় ছোঁয়াবো ?
মাংস ছেঁড়া দাঁতে শ্বাপদগন্ধ, পতিত মানুষ অধিক অধঃপতিত আমি
চুপসানো হলদে স্তনে ব্যর্থ চুম্বনরত
আদিগন্ত আতাম্র মাঠে ঝলসানো বুক
ফিরে এসেছি মহারাজ তোমার পদসেবায়, প্রেমে।
দ্বিতীয়ার চাঁদ ধনুকের মতো ধরে আছো বাহুতে
আমার শরীর ছিলায় পরিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছো পাতালে, শিলায়, নীলিমায়
এ তোর উপহাস নাকি ভালোবাসা?
ভুমিকম্পে প্রলয়ে জেগে উঠি রাত্রি দিবসে
নীল বিষফুলে সাজিয়ে তুলি তোমার অন্তহীন সূবর্ণ চাঁদোয়া
হে মহাত্রাতা,তবে কি আমার পরিত্রান নেই ?
১৯৭৯- ১৯৮০

## ২৩.

সকল গাঁথুনি ঢের আলগা হয়ে গেছে
জল হাওয়া রৌদ্র ঝড়ের আমার ভেতর অবিশ্রাম জন্ম নেয় শুধু
অবিনাশী ক্ষুধা - অর্থহীন পরিক্রমায়
পৃথিবীর শরীরে ক্ষোভ, নক্ষত্রের বুকে ঘাম
হঠাৎ হঠাৎ বিদ্রোহ ঝড় শিলাবৃষ্টি।
পর্যাপ্ত খাদ্য নেই, মাটির উর্বরতা ঢের হ্রাস পেয়েছে
তবু কেন জন্ম নেয় সঙ্গমেচ্ছা, সন্তানপালন?
আমার ভেতরে অবিনাশী ক্ষুধা
ভরদুপুরে ঘুমজাগরণ অস্থিরতায়
ব্লেডে হাতের শিরা কেটে রক্তচোষা অসহ্য অবিনাশী আমি
জন্মেই আমাকে কামড়ে দিয়েছে কেউ
এতো রক্তচোষনেও শুদ্ধ হলো না শরীর।
জন্মে এতো দাহ, সঙ্গমে এমন বিরহ সমস্ত কিছু এই
জঘন্য জীবিকা ফেলে যখনি আমি উঠোনে শিশুরখেলার সরঞ্জাম উল্টে
ছুটে যেতে চাই তিমির, হাঙরের দাঁত ঝলকিত তমসা- সাগরে
সামনে দাঁড়ায় এসে নির্লজ্জ থকথকে জীবন, আত্মার বিষয়।

পৃথিবীর তামাম জীব, এক বছরের আগাম খাদ্য সঞ্চয় করে রাখো
আগামী সনে বৃষ্টি হবে না
আমি শুধুমাত্র ঝরাবো বিষ, বৃষ্টিধারায় বিষ, রক্তবিষ
হয় পূর্ণ শুদ্ধি না হয় মৃত্যু। ক্রমশঃ ছোটো হয়ে আসছে আকাশ
আকাশে কালো ঘামের ঝর্ণাধারা,
বসবাসের কোনো অনড় মন্ত্র আমার জানা নেই
প্রেমে বৃক্ষে মৃত্তিকায় ঈশ্বরে সন্তানে আমার উদ্ধার নেই
কেউ কথা বলো না, বাঁশি বাজিও না
ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে জীবন
তার বুকে ঘাম, পেশী শিথিল, বিষ ঝরাতে দাও, অবিশ্রাম রক্তবিষ।

## ২৪.

আমার কপালে বুলেটের মতো ঢুকে গিয়েছে তোমার মুখ।
ক্ষতচিহ্নের রক্তপাত আঙুলে মুছে নিয়ে
আমি নগরের দেয়ালে দেয়ালে বৃক্ষের বাকলে
লিখছি তোমার নাম,
তোমার অধর- সুবাসের কথা বলে এসেছি
নরোম রাত্রির মাথায় নক্ষত্রের আগুন জ্বলা অপরূপ মোমবাতির কাছে

মুমুর্ষ আমি, তাই থাকতে চাই
কোনো চিকিৎসার নেই প্রয়োজন আপাতত
হিরন্ময় অসুস্থ আমি, তাই থাকতে চাই-
আজ সারারাত পরিপার্শ্ব স্পর্শ করে পাই নি
জীবনধারনোপযোগী উষ্ণতা-
বাহুবন্দী স্ত্রীর ধড়হীন মুন্ডু, তিনমাসের শিশুর নাড়িভুড়ি
ক্রমশঃ নিকটে অগ্রসরমান
আসন্ন পারমাণবিক যুদ্ধে ঝলসানো পৃথিবীর চিত্রলিপি সাঁটা
চার দেয়াল- এসবের ভেতর জড়োসড়ো
আজ সারারাত নিঘুর্ম উৎকন্ঠায়, বায়বীয় বিষপ্রবাহে
প্রাচীন রাজার সজ্জিত অশ্বের হ্রেষাধ্বনির ভেতর
আমার কপালে বুলেটের মতো ঢুকে গিয়েছে তোমার মুখ
আমার কোনো কর্তব্য নেই
শর্ষে ক্ষেতের ভেতর শুয়ে থাকা আমি সুবাসিত সবুজ মানুষ
শ্যামাঙ্গী মসৃণতায় মিথুনলগ্ন পাখি ও বাতাস-
আমার কপালের ক্ষতচিহ্ন ঢেকে আছে সমরাস্ত্র অন্ধ-করা তোমার চোখ
এই যে তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ।

১৯৭৯- ১৯৮০

## ২৫.

মধ্যরাতে দরোজায় কড়া নাড়ে
কবরের মাটি সরিয়ে উদ্ধত উঠে আসা আমার কঙ্কাল।
তড়িঘড়ি শয্যায় উঠে বসে আমি দেখি
বুকের মাংস যোনির আকারে ফেটে গিয়ে
তৈমুরের তলোয়ারের মতো ঝকঝক করছে
আর তার ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত
আমার চোখে দু' হাজার রমণীমুখ
ঠান্ডা  কঙ্কালফুল হয়ে ফুটে উঠলো।
পুতুলের মুখের মসৃণতায় হাত রেখে
একদিন তাকে মনে হয়েছিলো মানুষের অধিক মানুষ
আজ সে মিথ্যে মাটির প্রলেপ মুখে নিয়ে
ছুঁয়ে যায় ভূমধ্যসাগরে ভাসা নাবিকের লাশ।
আমি বুকে হাত রেখে অনুভব করি
অঙ্কুরিত সবুজের লাবণ্যে লজ্জাবতী ধরিত্রীর
প্রথম মাতৃত্ব অতিক্রম করে
চাঁদের সঙ্গমে আন্দোলিত দু'ফাঁক কোমলতায় জন্ম নিচ্ছে
অন্তরীক্ষে প্রবাহিত অগ্নিগিরি, নিহত ভ্রূণের চোখ

আমার বুকে একি যোনি নাকি অর্জুনের এর ধনুক ?
যমজ ছিলায় উৎক্ষিপ্ত তীরের ঘর্ষণে
মহাকাশে অগ্নিরমণীর কপাল ফাটিয়ে বেরিয়ে আসা
সবুজ পায়রার হৃৎপিন্ড চিবিয়ে খেয়ে
ঠিক তিন বছর পর আমি আত্মহত্যা করে যাবো।

১৯৭৯

## ২৬.

মানুষজন্মে এও কি সম্ভব সবিতা, আমাকে শুধু দেখতে হলো-
সেই বুড়ি- দত্যিটাকে সময় মতো সিগ্রেট না খাওয়ালে তোমার আমার
এক দড়িতেই ফাঁসি হতো তার আগে দীর্ঘকাল
শিরা- উপশিরা কর্তন- প্রক্রিয়া। তথাপি দিন দুপুরেই
কোথায় যেন বেজে উঠলো ঢাকঢোল, কী ঘোষণা রাজার
ওগো পুরবাসী, নেশাগ্রস্থ আমার মেলে না কিছুই বাস্তবে
এখানে আসা- অবধি বীর্যধোয়া ঘুপচিঘর, অন্ধকারে
শ্রবণদর্শনরহিত সবিতা শারীরিক ভাঁজ খুলে খুলে দেখালো
তার সমস্ত অলংকার-  অনেক গভীরে দেখলাম জ্বলছে
নীল ধুপবাতি
সন্ধ্যাবধি নির্নিমেষ ডুবে ছিলাম প্রজ্জ্বলন- সুখ ও সৌগন্ধে
বিস্ফোরিত ধুপবাতি হঠাৎ সংক্রমণে ভাসিয়ে দিলো জগৎসংসার
ওগো পুরবাসী, এই কি জন্মের সমস্ত উপহার ?
কোথায় যেন বেজে উঠলো ঢাকঢোল কী ঘোষণা রাজার ?
মধ্যরাতে নিস্তরঙ্গ পাড়ায় ঘোড়ায় খুর ও প্রাসঙ্গিক চাবুকের শব্দে
ভেঙে গেল ঘুম, বেদম বাজছে ঢাকঢোল যেন ডাকা হচ্ছে,
নীলাম এ জমির-  আমি শুধু এক মুষ্টি মাটি চাই
কী দাম দিতে হবে বলো ওহে সাম্ত্রী সেপাই রাজার,
সত্যচুম, সত্যমাটি কতো দাম কতো দাম ?
জন্মের শেষ উপহার সবিতা তোমার আমার একরাত্রি
একঘরে বসবাস,
বুকে কান পেতে শুনি জ্বাজ্জ্বল্যমূর্তি ঘোড়সওয়ারের চাবুকাঘাতে
নীলাম পরোয়ানা পড়ে শোনায় ঢাকঢোল মধ্যরাত্রির-
এই শরীর বন্ধক রেখে কিনবো তোমাকে সাবিতা
ভোরের দেরী নেই বেশী, ওঠো মুখহাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নাও।

১৯৮০

## ২৭.

যাবার পথে শরীর বিছিয়ে তুমি সারাদিন ডাকছো আমাকে
তোমার কথার ময়ুরসিংহাসন আসে একটি পদভারও সয়না আমার
আগুন ছাড়া কিছুতেই ভারহীন হয় না শরীর
আমার জন্য নির্ধারিত অমৃত'ও তো পান করা যায় এক চুমুকে
মৃত্যু পর্যন্ত যাবো অনাহারে, আজ সবকিছুতে অনিয়ম-
অপরাহ্ন- ছায়ায় ঝংকৃত খেয়াঘাট পেরিয়ে স্বেচ্ছায়
সর্বদুঃখাক্রান্ত এদিক ওদিক সামান্য পরিবর্তন- নেশায়
নির্বিকার অঞ্জলি পেতে নিই দাম্পত্যবিষ, জন্ম- সংলগ্ন সন্তান- মালা,
কর্কশ বাহ্যিক রীতিনীতি কার্তিকের নীলাভ পূর্ণিমায়
ঢেকে আছে মধুরাতে, জন্মভূমি ঠুকরে খেয়ে এই শেষাবধি
আত্মভূক আনন্দ দাঁড়িয়ে আছি আলোছায়া নগ্নিকা নৃত্যপ্রবাহে
অপরাধহীন নিতে হবে ললাটে পুনর্বার সিফিলিস- জন্ম-
ভিক্ষুক- প্রভুর ছদ্মবেশে আমার সর্বস্ব নিয়ে নাও নৃত্যাভ করতলে,
হয়তো তাই তবু সশরীরে যুদ্ধ দেখি নি বলে
বলতে পারি না আমি আজন্ম বাসিন্দা যুদ্ধাহত ঘাসের
এমনি মায়াবী ধোয়ায় আচ্ছন্ন করে রাখে সারাক্ষন
ওই রোগাক্রান্ত রুপসী নিশ্চিত ছুঁয়ে দেবে আমাকে
নিদ্রাহীন জর্জর প্রবাহে আমি সহজেই পবিত্র হতে পারি
জন্মনদীর উদ্ধার- চুম্বনে, কিছুটা নৃত্যমায়ায় বেঁধে গেলে
ভারাক্রান্ত মালা

শিথিল- বলিষ্ঠ যুগল আলিঙ্গন- বিদ্রোহে-
তোমার চিবুক অমোচনীয় আদ্র রেখা
তেমন নদীতীর পায় নি মানুষ যার প্রলেপে দ্বিধাহীন শুদ্ধ
হবি তুই,
মাটি খুঁড়ে এতোদিন মাটি হবার পর 'আঘাত' শব্দের
যথার্থ প্রতিরূপে খুঁজে পাই পাপ ও প্রদাহে- যুদ্ধ দেখি নি
হয়তো তাই তবু বলতে পারি না আমি বোমারু- আক্রান্ত মানুষ।

১৯৮০

## ২৮.

মাটি খুঁড়ে প্রাকৃতিক গন্ধ ও সুষমায় এদেশ
তার সবটুকু জন্মবীজ মৃত্যুবীজ নিষ্পলক জেগে আছে
অনিদ্রামাধুরী
এক অনাদি আত্মভুক দরবেশ শুধুমাত্র হাড়গোড়ে মধ্যরাত্রে
হেঁটে আসে
পান্থশালায় অনিরুদ্ধ পিপাসায়- - রাতভর দাঁতহীন মাড়িতে
খোঁড়ে পলেস্তরা ইট পাথর, নিত্যন্ত করুণায় তাকে
বাড়িয়ে দিই জিভ তারপর তার উদরবিদীর্ণ চিৎকারে
এতদিনের প্রশান্ত পান্থশালায় চিরায়ত মহাযুদ্ধ, মৃত্যুমাধুরী ঠোঁটে
অবশ অগণিত আশ্রয়প্রার্থী উগরে দেয় নাড়িভূড়ি
নৈসর্গিক আলোছায়ায় উন্মথিত প্রলাপ জেগে ওঠে-
চিৎকারমাত্র বাড়িয়ে দেই জিভ, এর বেশী কিছুই আপাততঃ
অধিকারে নেই
আমাকে ঘেরাও করে যতোই করো মারধোর, ভেতরে যতোটুকু
তার বেশী জলের অধিকার যার কুক্ষীগত হয়ে আছে জন্মাবধি
তার দেখা পাইনি আজও অর্থহীন সকল বিদ্রোহ, তার ইচ্ছামাফিক
করুণা সিঞ্চনে যেদিন নিরন্তর বয়ে যাবে জলধারা
সেদিন নিশ্চিত থাকবো না আমি, তার অপোয় উর্দ্ধমুখী অনড়
কামড়ে থাকো মাটি আমি থাকবোনা, ধুলো- জিভে হঠাৎ হঠাৎ
ক্রুদ্ধ মাথা তোলে সাইমুম, সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে ফেলি
ছিঁড়ে ফেলি
এই আমার একমাত্র ধ্বংসমাধুরী। প্রভাতের প্রাত্যহিক পবিত্রতা,
শিশির- সিঞ্চন শুধুমাত্র শুনেছি লোকমুখে, দেখি নি কোনোদিন
বিশ্বাসও করি না- শীতলতায় যদি একবার সমৃদ্ধ হয়
উষর মাংসভূমি নির্দ্বিধায় রেখে যাবো নিবেদিত নমস্কার
প্রাকৃতিক গন্ধ ও সুষমায়, তা হবার নয় জানি-
তবু আমাকেই নিতে হয় ভার বারবার রসদবিহীন উন্মাদ
পান্থশালার।

১৯৮০

## ২৯.

কোনো কোনোদিন স্নান করার আগে একঘন্টা
শর্বাণী,
তোমাকে অসহ্য মনে হয়
যাবতীয় কোমলতা দাঁতে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়
নির্মম রক্তস্রোতে
পৃথিবীর মেকআপ ধুয়ে মুছে খসে পড়ে
ময়ুরীর পালক পুড়ে যায় সবুজের সুনীল অগ্নুৎপাতে,
একঘন্টা আত্মহত্যার আগের প্রতিটি চুল
কালনাগিণী অনুভব লক্ষ্যভেদী ফণা তোলে
উদ্ধত আঙুলগুলো আপন গলার দিকে ধাবিত-

অপ্রেম- উত্তাপে জলহীন
রাধা যায় যমুনার ঘাটে

কোনো কোনো দিন স্নান করার আগে একঘন্টা আমার এরকম
কাটে।

১৯৭৮

## ৩০.

সঞ্চিত হোক মাতৃত্ব মেশা কামুকতা
সঞ্চিত হোক সঞ্চিত হোক মাটি, যথাসাধ্য মৌসুমী হাওয়া
তরল রাত্রির বিষে জ্বলন্ত পাথারে
মুমূর্ষু মাছেদের নতুন আবাসভূমি
ফুটপাতে গলিত সংসার
অন্ততঃ স্থিতি হোক সামান্য চালায়
সঞ্চিত হোক কমলাগন্ধ,
কচি লেবু পাতায় প্রভাতী সূর্যের সৌরভ
তবেই তুমি হবে
সঞ্চিতা,
যথাযোগ্য নারী।

১৯৭৯

## ৩১.

মাথা ঘুরে আসে সপ্তসিন্ধু, পরে শিরস্ত্রাণ
ধড় পড়ে রবে ধুলোয় তা হবে না আর
সর্ব শরীরে পরিভ্রমণ চাই- যার দরকার
ধুয়ে নেবে হত্যায় অভ্যস্ত হাত, ধুলোর সংসার।

কী বলিদান চাও জননী
মুক্তিপণ দেবো মাথা কেটে
শিকল ছিঁড়ে দাও আমি দেখবো আমাকে।

যেখানেই স্নান করি
আমার গোটা শরীর ডোবে না জলে
ডুবলে সত্যি
মাছেদের ক্রীতদাস হয়ে কাটিয়ে দিতাম বাকী জীবন।

হাত তুলে বললাম বাতাস থামো।
ঘুড়ি ওড়ানোর দিন শেষ হয়েছে বহু আগে
এবার উড়বো আমি দেখি তো কেমন পারো।

## ৩২.

নামধাম জন্মসূত্র একে একে মুছে যায় শেষরাত-
এখানে ওখানে জ্বলে নিথর কুয়াশা ভেজা ঘরদোর, পুষ্ট গেরস্থালি,
আক্রোশে দুই পাড় ভাঙে ইছামতি
দয়াধর্মে পূন্য হলে জল প্রবল পাহাড়চুড়ো
ভেঙে ভেঙে মিশে থাকে নৈঋতে নুব্জ মেঘলোকে-
শারীরিক সকল রণ মুখ বুজে এই পড়ে থাকা
কন্ঠস্বরে কার অভিশাপ জ্বলে আলনায় পুরোনো পাঞ্জাবী,
হাফসার্ট ;
গতর 'ধুয়েছে' ধারাজল মাংসজ রণ পদচ্ছাপে মিলেমিশে
আদিম রহস্যে কাঁপে শেষরাতে-
মাটির তৃষ্ণা উর্দ্ধে অর্ধেঃ ঝড়ো হাওয়া
তাঁবুতে বসবাস আদিম রান্নাবাড়া দগ্ধ কেশপাশে
ছিন্নভিন্ন ওড়ে নৈঋতে-
জন্ম শেষে মৃত্যু আস্বাদন ওষ্ঠপুটে;
ছোঁয়াচে ক্ষতচিহ্ন ফেটে তরল সংহার তীব্র জ্বলে বাসঘর,
স্মৃতিলগ্ন স্পর্শ বিষ
ওই দূরে আছড়ে পড়ে চাঁদের পাহাড়ে,
পাশাপাশি কিছুক্ষণ আলোর প্রহারে দৃশ্যমান তটভূমি
দীঘল পালে ভাসে নাও জনমানবহীন, মধ্যসমুদ্রে;
কে কাকে চায় ভেসে যায় উদাসীন মেঘ গৌরীশংকরে,
এখানে তীর্থভূমি গঙ্গাতীরে জলের প্রবাহ শোনে, একদিন
পূণ্যস্নানে
পূবাকাশ নিরঞ্জন অবয়বে মুছে ফেলে সূর্যোদয়, রজঃস্বলা
রঙবাহার
কার কাছে কী চাও দেয়ালে বিদ্ধ শরীরভার নিত্যনব
পেরেকপিয়াসী।

১৯৮১

## ৩৩.

সূর্যাস্তে ইছামতি কাঁদে হয়তোবা হাসে জলজগভীরে
একটি পদশব্দ চেয়ে আজন্ম নুয়ে আছে মাটি- এতোখানি
তুচ্ছতা শেষে
স্বপ্ন স্বপ্নে শেষ হয় মধ্যরাতে, তথাপি উপত্যকায় ঘন ঘাসে
দিনে দিনে জমে ওঠে ঋণ, বিদায়দৃশ্যে একবার কাঁদবে নদী
তারপর ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব প্রহারে- নিশ্চিত মৃত্যু ছুঁয়ে
সূর্যাস্তে ইচ্ছামতি কাঁদে হয়তোবা হাসে জলজ গভীরে;

আত্মহননে সততঃ তৃষ্ণাতুর ঠোঁট শোনে ধীর পদশব্দ
উজান ভাটায় তিরতির দয়ার্দ্র শরীর,
সন্ধ্যার কপালে তামা লুব্ধ প্রতারক
শেষবার জ্বলে নেভে, ম্রিয়মান উদ্বন্ধনে কাঁপে, আকাশী দুঃখের ছায়া
বিস্তৃত এপার ওপার, বাসঘরে নীলপ্রদীপ নীলাচলে ব্যপ্ত নদীতীর
এভাবে জন্মে উত্তীর্ণ আলো খেলা করে সারারাত ভেতরে বাহিরে
জানালায় নত শরীর মিলেমিশে উত্তরে হাওয়ায়
কৃষ্ণচুড়ার সোহাগে অঞ্জলী-পরায়ণ মেঘে ও মায়ায় ভাসে জন্মাবধি
আজ উত্তরে সপ্তর্ষি ছোয়া বিদায় কেশভার, বিপন্ন দৃষ্টি পোড়ে
পরামার্থ আয়ু
চন্দ্রালোকে থই থই ভাসমান অবুঝ সংহারে
এখানে জন্মের সকল ক্ষরণ তৃষ্ণাতুর বৈশাখী দিনশেষে
আর্দ্র আলোয় প্রবাহিত নীলিমায়,
এভাবে ছায়াপথ আলোছায়ায় ব্যপ্ত জীবনান্তরে
ওই প্রবাহে একদিন সমৃদ্ধ বসবাস হবে গোধুলি- জন্মের
তীরে তীরে
সূর্যাস্তে ইছামতি কাঁদে হয়তোবা হাসে জলজ গভীরে।

১৯৮১

## ৩৪.

দীর্ঘপথ, উত্তরে হাওয়ায় ভাসমান চাঁদের আড়ালে
জেগে থাকে হীন বসবাস, ঘৃণা- মধ্যরাতে ভাঙা আকাশে
প্রতিবিম্বিত জীবন ও জলাধারে ক্লিষ্ট পিপাসা কাঁপে;
অলক্ষ্যে কেউ কষ্ট পাক কিবা এসে যায়, বৈশাখী মেঘে মেঘে
স্মৃতিচিহ্ন, সারাদিন বৃষ্টিপাত, বজ্রশব্দে ভয়ার্ত আসবাব
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পুরানো কাগজপত্র; দোমড়ানো ফটোগ্রাফে
দিবারাত্র যে জেগে থাকে মগ্ন সুদুরে তার উপহার নেই আততায়ী-
হাতে,
কথাবার্তা, চালচলনে এত হিশেব- নিকেশ, মাটি ও মেঘের অভ্যন্তরে
যথেচ্ছ জন্মে হাহাকার, মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি, প্রতি সন্ধ্যায় মঙ্গলঘট-
হঠাৎ কাঁপিয়ে সকল দ্রাঘিমা ব্যাপ্ত পূর্ণিমায়
নবান্ন উৎসব মাটির কিনারে, ওই আলোকধারায় মুগ্ধ চোখ
পরক্ষণে বাজে বজ্রে ভাসায় দীপ্ত ভেলা ক্ষুব্ধ আবর্তে ইছামতীর-
তথাপি একদিন ঘর বাঁধে জলস্রোত, নবজাতক জাহ্নবী স্বচ্ছতা
দিনে দিনে প্রবাহিত বটঝুরি- দোলনায় শৈশবে ধুলোর আঘ্রাণে;
একজন্ম পিতৃহত্যা- পিপাসা সহসা শেষ হলে সন্ধ্যায়
পাপিষ্ঠ হাতের কিনারে, সকল লগ্নতা চুষে ক্রুদ্ধ একাকী মানুষ
ব্যর্থ কোলাহলে কাঁপায় সম্বৃত সম্বৃত গেরস্থালি, দীর্ঘপথে পূর্ণিমা
তমসার কাছাকাছি কাছাকাছি এসে ছড়ায় পরাধীন বৃষ্টিধারা
মায়াবী আতুর- গন্ধে আকুলি- বিকুলি অনর্থ উদয়- শেষে-
মলিন বিকেলে সিক্ত বসতি জুড়ে অশরীরী আনাগোনা, অদৃশ্য
চাবুকাঘাত
পশ্চিমে ডেকেছে বান, খানখান ভেঙে পড়ে পূর্বী- জনম !

১৯৮১

## ৩৫.

সমৃদ্ধ হও তোরণ শেষরাতে- নীমিলিত পূবাকাশে
চুম্বনে অধীর মাটি ও গৃহমূল ফেটে বাঁশি বাজে তেপান্তরে
অবোধ্য বিবমিষা ও প্রলাপে অনন্তকাল জেগে আছে দেশ
অনাহারী বাতাসে শীতার্ত সন্ধ্যার উপকূলেঃ
চিত্রিত মুখের আভাস শেষরাতে ধুয়ে মুছে জলধারায়
তুমূল বৃষ্টি হলো পরদিন অপরাহ্ন তটে- এবার যাত্রার শুরু,

সমৃদ্ধ হও তোরণ শেষরাতে, সোজাসুজি পশ্চিমে যাবো
যেখানে প্রতিদিন সূর্য ভেসে যায় প্রাচীন আঁধারে
তারও ওপারে মন্দিরে প্রত্যহ পূজোর ঘন্টা বাজে
আমি শুধু বাহ্যিক কারুকাজ দেখে ফিরে আসবো
যে যাবার যাক ভিতরে- একটি আল্পনা ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ অবয়ব
ঝুলে আছে অশরীরী উদ্বন্ধন ও কোলাহলে, নিথর কপোলে রেখে

হাত

সারারাত নিশ্চুপ শুনে যাবো কলঘরে অতিষ্ঠ জলপ্রপাত
এভাবে পাপমোচন মিশে থেকে নদী ও নীলিমার উপরিভাগে
মাতাল ঠোঁটের উপকূল ঝরায় রাত্রিদিন নিরক্ত বিবমিষা-
পিতৃহীন টলোমলো পথঘাটে একসময় নামে ঘুম
মধ্যরাত পেরিয়ে যাবার পর নিথর পানশালায়
সমৃদ্ধ হও তোরণ সুনাব্য হাওয়ায়, পশ্চিমে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকা

ক্রুদ্ধ জন্মের ঋণ- দুর্বাদলে শিশির এদেশে কামোন্মত্ত

হাহাকারে কাঁদে, রোগাক্রান্ত পার্থিব দুয়ার স্পর্শমাত্র

খুলে যায় আধার নৈঋতে, ধুলোর সংসার আজ বৃষ্টি হবে।

১৯৮১

## ৩৬.

নীলাভ্র মেঘে মেঘে ঢেকে যায় সমাধি ও পাহাড়
আমি এখানে দাঁড়াবো- পরিত্যক্ত জন্মভূমি অমলিন ডালপালায়
ডাকে কৈশোরিক বটছায়ায়, লাল জলে ভীতিপ্রদ ডুবসাঁতার
বাবার প্রাচীন নৌকো খালে খালে ভাসে, অসীম পাথারে;
দোনলা বন্দুক, পাখি শিকার, বুনো উৎসব গৃহস্থ আঙিনায়
সন্ধ্যাবধি ধুলোমাখা, উত্তুরে হাওয়ায় কাঁপে বটপাতা
শৈশব- শিহরণে জাগে জন্ম ও জন্মভূমি, দশ বছর পেরুতে না
পেরুতেই নদীর এপার ;

আমাকে পৌঁছুতে হবে দিনাবসানে নীলাঞ্জন
যমুনা কিনারে- রাখাল জন্মে কৃষ্ণমথুরা বৃন্দাবন কই আমার?
ধুলোর সখী পাহাড়ে এসে ভুলে যায় সব
স্মৃতি চিহ্ন লোপাট ডোবাজলে ব্যাঙাচি ধরার উৎসবে;
নীলাভ্র মেঘে মেঘে জাগে বটতলা, বালুচরে শীতল জাজিম,
রৌদ্র- শরে পোড়ে শৈশব, স্মৃতি, নাড়ার দহনের আশেপাশে
যুগলবন্দী মাটি ও আকাশ- হরিপুরের মেলা
দশ বছর পেরুতে না পেরুতেই নদীর এপার
ওপারে সূর্যাস্তে, ঘূর্ণমায়ায় জেগে থাকি রাত্রিদিন জলের কিনারে
যে আসে সে আর ফেরেনা কখনো- আমি এখানে দাঁড়াবো
চন্দ্রাতপে জাগে হিম সংহার অদিতি উৎসব, নদীতীরে তৃষ্ণাশেষে
একদিন যাবো ঠিক কৈশোরক ওপার, ধুলোর জাজিম বটতলা
সূর্যাস্ত আলো ও আঁধার ঢেকে যায় বিপন্ন স্মৃতি এলোচুল
ওড়ে নীলিমায় কেশপাশ ভঙ্গুর বৈশাখী বিদ্রোহে
রৌদ্রাভ প্রবাহে প্রবাহে অমোচনীয় খেলাঘরে প্রকৃত বিবাহ।

১৯৮১

## ৩৭.

মধ্য-দুপুরে ঘর্মাক্ত ধুলো ও বাতাসে ক্ষীয়মাণ চিলের হাহাকারে
সকল পথে ও পান্থশালায় বৈশাখী ঝড়োবৃষ্টি
কাঁপায় আলোকময়ী মাংসজ প্রতীমা, মিনারে মিনারে মেঘ,
স্বয়ম্ভূ আলোর শরীরে ব্যপ্ত মধ্য দুপুর- স্নানরতা হাতের আভাস
আশেপাশে শুয়োরের পবিত্র অধিবাস
আনন্তিক মহাকাশে দীপ্ত পঙ্খীরাজে ক্ষীয়মাণ চিলের হাহাকার
কেউ কাছে ছিলো একদিন তার কেশভার
সামুদ্রিক হাওয়ায় ও হাস্যরোলে ভাসে সান্ধ্য পূবাকাশে
কেউ কাছে ছিলো একদিন তার স্মৃতি চোলাই- এর গন্ধে মিলেমিশে
ভারাক্রান্ত নিঃশ্বাসে কাঁপে রক্তাভ চোখের কিনারে-
এভাবে নিত্যদিন যাওয়া আসা, নিবুনিবু টেমির আলোয়
ভৌতিক ছায়া- প্রচ্ছায়া মাতাল হাতের ইশরায় ছোটে দিগ্বিদিক
পিতৃপরিচয়হীন স্মৃতিচিহ্ন- মলিন নীলাভ দিগ্বলয়,
প্রতিবার শব্দ ও সংঘাতে খুঁজে ফেরা চেনা পথঘাট
পরিত্যক্ত ভিটের মায়ায় যাবতীয় পথ ও পথপাশে ক্লিষ্ট অনাহার
শেষ হয়না কখনো, জন্মবধি জেগে থাকে ক্ষুধার শরীর,
প্রত্যহ শবানুগমনে সিদ্ধ পদপাত একদা মিশে যায়
সন্নত আকাশে মেঘের ওপার পবিত্র আলোছায়ায়
পূর্ণ চাঁদের মায়ায় প্রথম পরশ রাত্রি, হঠাৎ নির্বাপিত তারায়
হিমস্রোত
ঝরে রাত্রিদিন শ্যামাঙ্গী খেলাঘরে, পুষ্প ও প্রবাহে
উন্মথিত হাস্যরোল উড়ন্ত ধুলোর কাছাকাছি এসে প্রতিবার
বিঁধে থাকে মানবিক স্পর্শের অতীত বাসন্তী চিত্রপটে-
কেউ কাছে ছিলো একদিন, মধ্যদুপুরে ধুলো ঘাম গলিত শরীর।

১৯৮১

## ৩৮.

চুপচাপ শুয়ে ছিলো এতকাল আজ তাকে ডেকে আনি
তাকে ডাকার অধিকার অর্জনে সমর্থ কতিপয় মানুষ
সামান্য ইন্দ্রিয়বোধের অনুভব- অতিরিক্ত ব্যক্তিত্বে প্রতিবাদহীন
নৈসর্গিক বিদ্রোহে ওলটপালট আঙিনায়
মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।
অভিমানী সে, নির্বিরোধ ব্যপ্ত করে আছে সৃষ্টি- চরাচর
আজ তাকে দেবো কিছুটা নশ্বর রূপ, ধরাছোঁয়ায়
বোধগম্য ও বন্দী,
সলাজ রাঙা বউ এর ঘোমটা টানা মুখ, গার্হস্থ্য স্বভাব
তার যোগ্য বাসঘর খুঁজে নেবার আজ যোগ্য দিন
আজ হৃদয়হরণ বাতাস, বৃষ্টিধারায় মেঘে- মেঘে আলোছায়ায়
নির্বাক স্থবির আবরণ খুলে দিয়ে নিজস্ব বংশবৃদ্ধি
বসবাসের সমস্যা বিষয়ে গম্ভীর আলাপে মেতেছে গাছেরা
একটু পরে হাসি ঠাট্টা, গান বাজনা, এসবও হবে।
শ্বাসকষ্টে ফুলে ওঠে ঘর্মাক্ত মিলন- রাত্রি, একটু পরে ফেটে যাবে
তারপর প্রতিটি প্রাণীর দেহাবরণ ঘিরে সুবর্ণরেখা,
নিথর জলে ইচ্ছাধীন অলস নৌকো, মিঠে জল, মৃন্ময়ী মেয়ের
সায়া ও ঘুঙুর। সে পৃথিবীতে এসেছিলো একবার
তামাটে মাটির বর্শা- বিকিরণে তার ডানা ছিঁড়ে গেছে
চিবুকে বিষাক্ত ক্ষতচিহ্ন জোড়া দিতে সে লুকিয়ে এতকাল
নীলিমায়- মেঘে ও শুভ্রতায় ধুচ্ছে মুখ।
তাকে দেবো সামান্য মৃন্ময়ী ভালোবাসা, মাটির ঘর, ভরা শাওনে
প্রতি বছর পার্থিব সীমানাবৃদ্ধি, আঙিনায় সজনের ডাল,
ডাগর ঘাসফুল, জলধারায় সুগন্ধি মাছের ডুব সাঁতার-
মেঘে- মেঘে বেলা কাটে, নিথর দ্বিপ্রহরে কলমিশাক তুলতে
খোলাবুক জলে নামে কিশোরী, কলমিলতা ছিঁড়ে নেয় তার হাত,
হরিদ্রাভ আলো, জলে নর্তকীর কোমরভঙ্গি,
ক্রমশঃ বিস্তৃত সীমানা, মহাসাগর
পূণ্য বলিদানে খিলখিল হেসে ওঠে স্তব্ধ মহাকাশ
সওদাগর নৌকো ভাসাও, মধুমালার দেশে যাবো।

## ৩৯.

### ক.

সকাল হলে
একটি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো
আজন্ম পরিচিত মানুষ ছেড়ে চলে যাবো
মৃত্যুদন্ডিত
মৃত্যুদন্ডিতের মতো,
অথচ নির্দিষ্ট কোন দুঃখ নেই
উল্লেখযোগ্য কোন স্মৃতি নেই
শুধু মনে পড়ে
চিলেকোঠায় একটা পায়রা রোজ দুপুরে
উড়ে এসে বসতো হাতে মাথায়
চুলে গুজে দিতো ঠোঁট
বুক- পকেটে আমার তার একটি পালক

১৯৭৮

### খ.

সে মাঠে এখন ইতস্ততঃ ছড়ানো থাকে স্তুপাকার
মানুষ গবাদি পশু ফসলের কৃষ্ণ কঙ্কাল
রঙিন ঘুড়ির ধ্বংসাবশেষ, খরগোশের পশম-
শুভ্র জলের সঞ্চলণশীল সোনালী মাছেরা মরে গেছে
একে একে পৃথিবীর নিয়মে,
বালুকা- ছড়ানো চন্দ্রতাপে বাষ্পিত সে জল উড়ে গেছে
নীলে নীলে শুণ্যে
সারা মাঠ এক্ষুনি উঠবে ফুঁসে লেলিহান প্রচন্ড অগ্নুৎপাতে
মহাশূণ্যে মাংসময় যৌবনে প্রথমে একবার বহুবার
আমি মুখোমুখি সে মাঠের যেন যাযাবর
আজন্ম উদ্বাস্তু দুজন।

১৯৭৬

## ৪০.

তুমি হেসেছিলে-
অমন প্রলয় জরায়ু-ছেঁড়া মৃত্যুর রাত্রে
আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি মৃত্যু
অজস্র পদ্মগোখরা উদ্ধত ফণায় ফণায়
নিয়ে এসেছে এক একটি জ্যোতির্ময় দেবশিশু

তুমি হেসেছিলে-
আমার সমস্ত বাতাস জুড়ে শিশুর মুখের গন্ধ
জন্ম যন্ত্রণায় থরোথরো ভূমিকম্প

তুমি হেসেছিলে- তুমি সহোদরা
একটি রাত শুরু মনে হয়েছিলো
আমারও বংশধর রেখে যাওয়া প্রয়োজন।

১৯৭৮

## ৪১.

কী যেন কী ফেলেছি আমি
আমার করতল ফেটে গন্ধ বেরিয়ে আসছে তার

লোহিত রমণীর পেলব গলায়
তপ্ত কড়াইতে ধানের মতো ফুটে ওঠে
জন্মের প্রথম পদতলে সবুজ মৃত্তিকা
তার ভেতরেই অকস্মাৎ ভেসে ওঠে
পশমহীন মসৃন মটরশুটীর খোলার মতো চেরা
এক টুকরো মাংস, তাপহীন উজ্জ্বল একটি দিনের আভাস
সবুজ মাটি, খড়কুটোর স্তুপের আড়ালে লুকোনো
একজোড়া নগ্ন বালক বালিকা

আমার করতল ফেটে গন্ধ বেরিয়ে আসছে তার
বস্তুতঃ সাবানে হাত ধুয়ে ফেলি বারবার
আরও গাঢ় হয় সে গন্ধ
করতলে বসে আছে দেখি হায়
অপাপবিদ্ধ কৈশোরের ছন্নছাড়া ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৭৬

কবি সুনীল সাইফুল্লাহ

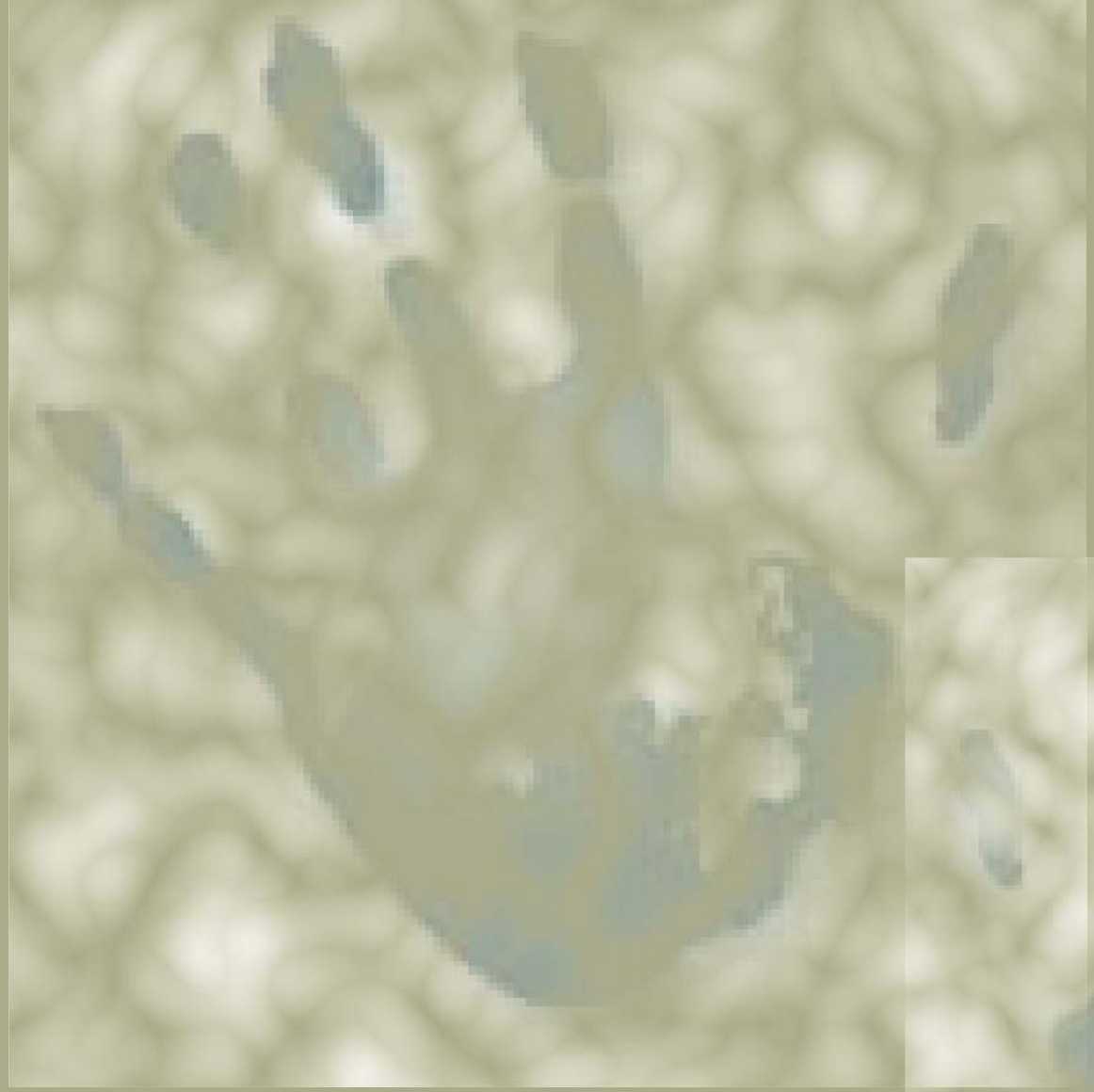

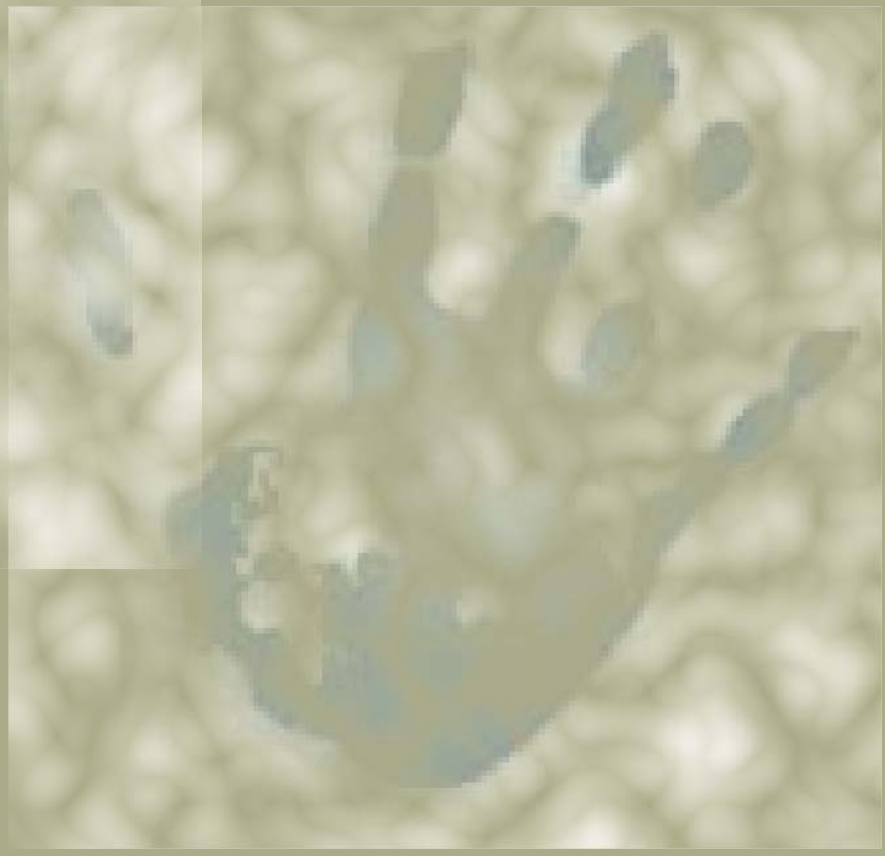

একটি
সচলায়তন
প্রকাশনা
www.sachalayatan.com